প্রসঙ্গ দেবদাসী

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

রত্নাবলী
১৭/৩, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

স্বত্ব : আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৭১

প্রকাশক
এস. চট্টোপাধ্যায়/রত্নাবলী
১৭/৩, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শিল্পী : সিদ্ধার্থ হোম

মুদ্রক
সুনীল ভট্টাচার্য
ব্লক অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং কনসার্ন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

৺মা

ও

৺বাবা-র

স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

সূচনা/১

বিশ্বপটভূমি/৫

প্রাচীন ভারতে দেবদাসী প্রথা/১৩

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপট/৩১

ধর্ম বিপর্যয়ের যুগ/৪৪

দেবদাসী প্রথার বর্তমান প্রেক্ষাপট/৫৬

দেবদাসী সংগ্রহ ও সমাজবিন্যাস/৬১

দেবদাসী প্রথা এবং ইহার নিরীক্ষা/৭৬

অচলায়তন ভাঙ্গার বোধ/৮০

দেবদাসী প্রথার বিবর্তন/৮৩

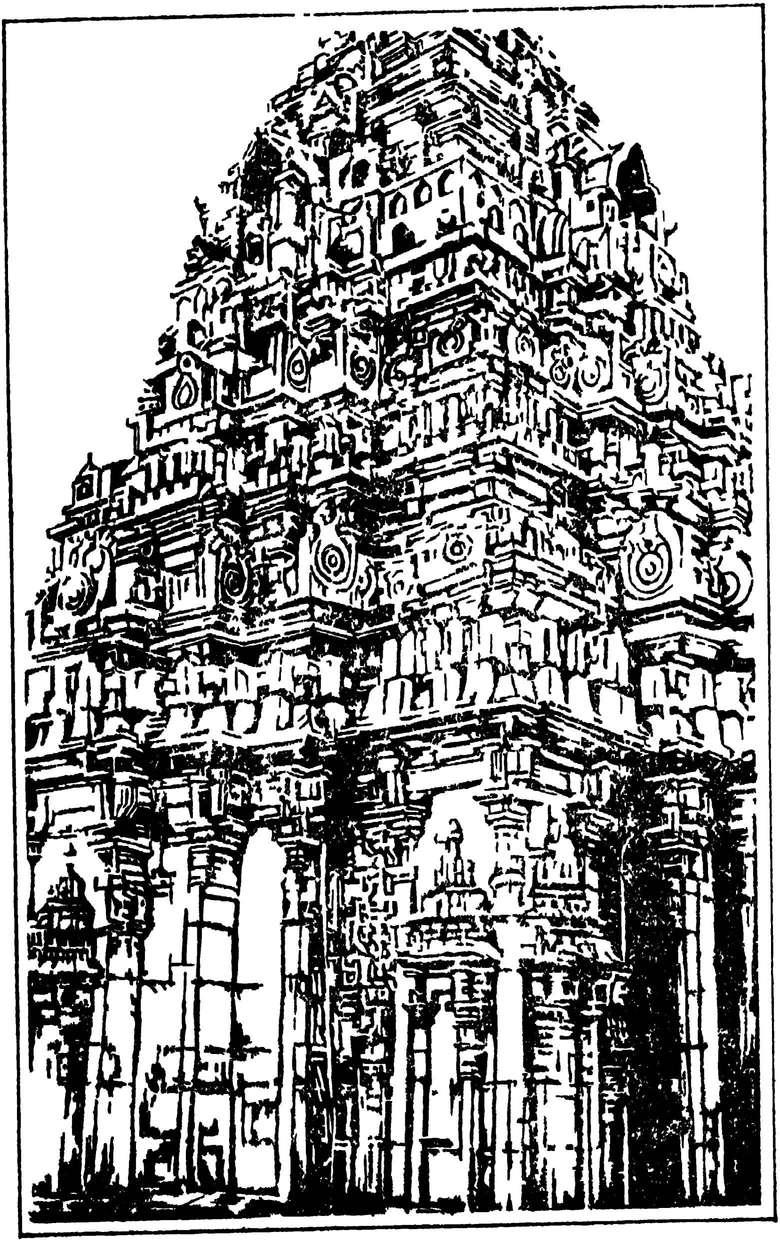

সৌন্দাত্তীতে অবস্থিত ইয়েলেম্মা গুড্ডা বা ইয়েলেম্মার মন্দির

পৃথিবীতে দাসত্বের ইতিহাস মনুষ্যত্বের গ্লানির কলংক বহন করে চলেছে। মানুষের কাছে মানুষের দাসত্বই হোক, বা বেনামে দেবতার কাছে মানুষের দাসত্বই হোক, উভয়ই কলংকবাহী। তবে দেবতার নাম নিয়ে পৃথিবীতে যতো অন্যায় হয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও মানুষের নাম নিয়ে হয় নি। কীভাবে এই দাসপ্রথার প্রথম সূচনা হয়েছে, কীভাবেই বা তা ব্যাপকতা লাভ করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয় নি।

দাসপ্রথারই একটা বিশিষ্ট দিক দেবদাসী প্রথা। দাসপ্রথার সূচনা আদিম সভ্যতার বিবর্তনের প্রাথমিক স্তর থেকেই; বিজয়ী জাতি বিজিত জাতিকে দাসে পরিণত করেছে। কিন্তু দেবদাসী প্রথার উদ্ভব আরো ঘৃণিত, কারণ এরা সবসময়ই নিতান্ত ভোগসুখের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত। মনোরঞ্জনই ছিলো এই দেবদাসীদের অবশ্য কর্তব্য। এই মনোরঞ্জন রাজার, রাজপুরুষদের এবং পুরোহিতদের। প্রধানতঃ পুরোহিতবর্গের চেষ্টায় এবং সহায়তায়ই এই প্রথা চলে এসেছে যুগযুগান্ত ধরে। অদ্যাবধি মন্দিরের আশ্রয়ে, দেবতার নামে চলে আসছে এই নির্লজ্জ নারীমাংসের ভোগ। অবশ্য মাঝে মাঝে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ এক ঝলক আলো ফেলেছেন এই সমস্যার দিকে, তবে তা নিতান্ত বৈচিত্র্যের সন্ধানে যতটা, ততটা এর ভীষণতার উৎস সন্ধানে নয়। ইতিহাসের রূপরেখা রচনার সময় ঐতিহাসিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কুপ্রথা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। অথচ এই প্রথা আজও চলে আসছে জনজীবনের অন্তরালে।

অবশ্য কোনো কোনো মহৎ ব্যক্তি এই দাসপ্রথার ভীষণতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ চিত্তে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন এই কুপ্রথার

বিরুদ্ধে। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এব্রাহাম লিংকনের নাম—দাসপ্রথার বিলোপ সাধনে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা আজ কে না জানে। বর্ণ-বৈষম্যের মাধ্যমে দাসত্বের নতুন রূপের অভ্যাগমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য এবং এই সংগ্রামে আত্মদান করে আন্তর্জাতিক শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন মার্টিন লুথার কিং। কিন্তু এই সোনার অক্ষরও অনেক কালির অক্ষরে চাপা পড়ে যেতে দেরী হয় নি। হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর 'স্পার্টাকুস' গ্রন্থে অমর করেছেন গ্ল্যাডিয়েটর নায়ক স্পার্টাকুসের অভ্যুত্থানকে, রোমান সাম্রাজ্যের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু এই কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোনো নামই ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যারা এই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, প্রতিরোধের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

খ্রীস্টান সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মানবতার মুক্তির আন্দোলনে প্রথম পথিকৃৎ। রোম সম্রাটের সামনে সেন্ট পিটারের আত্মদান এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। ক্রীতদাসবৃন্দ সংঘবদ্ধ হয়েছে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে, নতুন জীবনসংগ্রামের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে আত্মদান করেছে তারা মানব-মুক্তির সংগ্রামে। ধীরে ধীরে রাজশক্তিকে দাঁড়াতে হয়েছে সম্মিলিত জনশক্তির প্রবল প্রতিরোধের সামনে। রাজশক্তি বাধ্য হয়েছে মাথা নোয়াতে এই মানবতার সংগ্রামীদের কাছে। কিন্তু চতুর রাজশক্তিই আবার পরে মানবধর্মের এই বাণীকে কাজে লাগিয়েছে নতুন করে দাসপ্রথা প্রবর্তনের প্রচেষ্টায়। যে খ্রীস্টান সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের অধিনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল, তারাই গড়ে তুলেছে নতুন এক পবিত্র রোম সাম্রাজ্য, ধর্মগুরু পোপ যার প্রতিনিধি। নতুন করে আবার শুরু হয়েছে দাসনিয়োগ. সুরু হয়েছে নতুন এক দাসত্বের ইতিহাস। নানা ভাবে ব্যর্থ করা হয়েছে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, আবার নতুন করে মাত্রাসংযোজন চলেছে এই লড়াই-এ।

সভ্যতার ইতিহাসের এই গ্লানিময় অধ্যায়টিকে বিশেষ পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। মানুষের অধিকারের লড়াইকে স্পষ্টভাবে এবং সার্থকভাবে উপলব্ধি করে তাতে সামিল হতে গেলে এই ইতিহাস জানা দরকার।

দাসত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্যাতিত নারী সম্প্রদায়। মানব সভ্যতার যে কোনো বিপর্যয়ের সময় নারীজাতিই প্রথম বলিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নারীদেহ চিরদিনই উপভোগের সামগ্রীরূপে চিহ্নিত, সামান্য মানবমর্যাদাও তাই তার কাছে অপ্রাপ্য থেকে গিয়েছে। পণ্যের মতো দাসী বিক্রয় করা হয়েছে হাটে। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও এই পণ্য ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে নি,

তা চলেছে অব্যাহত গতিতে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় বেশ্যাবৃত্তি নারীর প্রতিই নির্দিষ্ট।

নারীপণ্যের একটা বড়ো হাট মন্দির প্রাঙ্গণ। দেবদাসীপ্রথা এই হাটের শর্ত। এ প্রথা নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারতবর্ষে এই দেবদাসী প্রথা সম্ভবতঃ সবচেয়ে ব্যাপক। ভারতীয় নারী সমাজ বহুযুগ ধরে এই প্রথার প্রভাবে অত্যাচারিত। এই প্রথার বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে সংগ্রামও চলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাবনার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। এক মনস্বিনী মহিলার নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদের যে সংগ্রাম শুরু হয়, তার ফলে দেবদাসী প্রথা বিলোপের জন্য মাদ্রাজ বিধান সভায় আইন প্রণয়ন করা হয় এই প্রথা নিষিদ্ধ করে। ভারত বর্ষের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মহিলা হলেন ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী। ডাঃ রেড্ডী দৃঢ় চিত্তে এই প্রথার অবসানের জন্য চেষ্টা করেন সমাজের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে। এ ছাড়া বোম্বাই বিধান-সভায় ডাঃ হরি সিং গৌরও অনুরূপ চেষ্টা করেন। এরপর বহুদিন কেটে গেছে। ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসী-প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে দেবদাসী-প্রথা আজও বিলুপ্ত হয় নি।

বর্তমানে নারী আন্দোলন এক নতুন দিকে অগ্রসরমাণ। কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতাই নয়, নিজস্ব চেতনার নতুন উন্মেষ এই নারী আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নারী দশকে সারা পৃথিবীর নারীসমাজ তাদের নিজস্ব সামাজিক স্থান গ্রহণ করার সংগ্রামে সামিল হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারীসমাজের ক্ষেত্রে এই বিশেষ আন্দোলনের দিকটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ কল্পে বর্তমানে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন 'দেবদাসী মুক্তি বাহিনী।' দেবদাসী প্রথা এখনো যে সমস্ত অঞ্চলে চালু আছে, তার মধ্যে প্রধান হ'লো কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কেরলের একটা বড়ো অংশ। এই দেবদাসী সম্প্রদায় সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানীয় সমীক্ষাও করা হয়েছে। আইনের বিরোধিতা করে দেবদাসী প্রথা কীভাবে চালু রাখা হয়েছে, তার পরিচয় এই সমীক্ষায় পাওয়া যায়। কী ভাবে দেবদাসী প্রথার সহায়তায় বোম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লী ও মাদ্রাজ শহরের পতিতালয়গুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলা হচ্ছে, তারও ইঙ্গিত এই সমীক্ষাগুলিতে

পাওয়া যায়। কারা এই প্রথাকে জীইয়ে রাখতে চাইছে এবং কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে তারও একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এই সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা পাই।

এই প্রথার সূচনা এবং তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে এ জন্যই নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। অতীতে কী ভাবে এই প্রথার সূচনা, কী ভাবেই বা এর বিস্তৃতি ঘটেছে, বর্তমানে এই প্রথা কেন বিস্তার লাভ করেছে, অতীত ও বর্তমানের এই অবস্থাগত প্রভেদটুকু জানা ও বোঝা প্রয়োজন। তবে এর ইতিহাস রচনা কারুরই একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। একটা বৃহৎ, সংগঠিত প্রচেষ্টা এর পিছনে থাকা দরকার। তবু এই অনুসন্ধানের পথে পদক্ষেপ করারও একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। এই পদক্ষেপের পশ্চাতে আরো বড় অনুসন্ধান প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে, এটুকুই একান্ত আশা।

বিশ্ব পটভূমি

ইতিহাসেব প্রাচীনতম যুগের সামান্য যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা গেছে, যতদিন পর্যন্ত হস্তচালিত যন্ত্রেব আবিষ্কার হয নি, ততদিন গোষ্ঠীবদ্ধ মানব-মানবী পরস্পর নির্ভরভাবে বাস করত। মানুষের যন্ত্র আবিষ্কার, ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সূচনা এবং বাজতন্ত্র সমাজে রাষ্ট্রভেদ ও শ্রেণীভেদের সূচনা করেছে, এই রাষ্ট্রভেদের ইতিহাসের শুরু থেকেই এসেছে দাসপ্রথা। বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রের লোকদের নির্বিচাবে দাসত্বে নিযোগ করেছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে মিশর। মিশরের ইতিহাসে আমরা প্রথম দেখতে পাই দেবদাসীবৃত্তির সূচনা। প্রাচীন মিশরের দেবতা ছিলেন 'আমন'। মিশবের 'ফারাও' বা রাজারা প্রথমে এই 'আমন', তাঁর স্ত্রী দেবী 'মুট' ও তাঁদেব পুত্র 'খোন্ সু' বা চন্দ্র দেবতার পূজা প্রচলন করেন। খৃষ্টজন্মের প্রায় ১৪০০ বছর আগে রাজা তৃতীয় আমেস হোটেপ থীবস নগরীতে মহাসমারোহে মন্দির নির্মাণ করে এই ত্রি দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় আমেন হোটেপের পূর্বেই প্রতিযোগিতামূলক ভাবে পূর্ববর্তী ফারাওগণ এই ত্রিমূর্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, তবে তৃতীয় আমেন হোটেপ নুবিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করে সেখান থেকে, এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে ধনরত্ন আহরণ করে বিজয় গর্বে সেই ঐশ্বর্যে দেবমন্দির নির্মাণ এবং দেবতার ভোগের উপকরণের জন্য ব্যয় করেন। থীবস-এর মন্দিরের দাসদাসী, ভূসম্পত্তি এবং রত্নরাজি ছিলো প্রচুর। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরোহিতগণও যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হন।

চতুর্থ আমেন হোটেপ, বা ইখনাটনের সময় 'আমন' মন্দিরের এই ঐশ্বর্য কিছুটা ম্লান হয়। চতুর্থ আমেন হোটেপ 'আমন'-এর পূজা নিষিদ্ধ করে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর রূপে সূর্যদেবের বা 'আটনের' পূজা প্রচলন করেন এবং নিজে নাম গ্রহণ করেন 'ইখ্‌নাটন' বা 'সূর্যদেবের প্রিয়'। তিনি থীবস নগরী পরিত্যাগ করে চলেও যান। কিন্তু তাঁর পর টুটেনখামেনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে থীবস তার পূর্বমর্যাদা ফিরে পায়। প্রথম সেতি (Seti) এবং দ্বিতীয় রামেশিসের সময় পর্যন্ত এই ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর অক্ষুণ্ন থাকে। ফারাও নিজেও বৎসরের বেশ কিছু সময় থীবস-এ কাটাতে থাকেন। এই সময়ের একটি দলিলে পাওয়া যায় যে, 'তৃতীয় রামেশিস 'আমন' মন্দিরের জন্য ৮৬, ৪৮৬ জন ক্রীতদাস-দাসী ও প্রচুর ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করেন।' এই দলিলটির নাম Great Harris Papyrus। সম্ভবতঃ মন্দিরের দেবদাসী নিয়োগের দলিল হিসাবে এটিই প্রথম প্রামাণ্য দলিল।

পরবর্তী রামেশিসের বংশধরদের সময় থেকে থীবসের অবনতি ঘটতে থাকে। খ্রীস্টপূর্ব ১২১০ অব্দে নবম রামেশিসের সময় রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে নানারকম নৈতিক অবনতি ঘটতে দেখা দিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ ক্রমে ক্রমে স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং স্থানীয় শাসনভার ক্রমশঃ 'আমন' মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে এসে পড়তে থাকে। রামেশিস বংশের শেষ রাজার মৃত্যুর পর মিশরের শাসনভার যুগ্মভাবে 'তানিস'-এর ফারাও ও থীবসের প্রধান পুরোহিতের হাতে ন্যস্ত হয়। পারস্পরিক বিবাহ এবং দত্তক গ্রহণ প্রথা এই দুই বংশে চলতে থাকে এবং 'তানিস'-এর রাজার কন্যারা থীবস-এর মন্দিরে 'আমনদেবের পত্নী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। এ'রা যথেষ্ট ক্ষমতারও অধিকারিণী হন।

এই ইতিহাসকে দেবদাসী প্রথার প্রাচীন ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সমাজের উচ্চতম কোটির রমণীরা এবং ক্রীতদাসীরা, উভয়েই মন্দিরের দেবদাসী পর্যায়ে পরিগণিত, তবে এই দাসীত্বের শ্রেণীভেদটিও লক্ষ্য করার মতো। এর পর আসীরিয় সভ্যতা ও ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতার ইতিহাসেও একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ যুগের সমস্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেবতারা ছিলেন মারডুক, শামাশ, তাম্মুজ ও ইশতার। দেবী ইশতারের সঙ্গিনীরূপে নারীগণকে মন্দিরে দেবদাসী রূপে নিযুক্ত করা হতো। প্রাচীন ব্যাবিলোনে এ নিয়মও ছিল, প্রতিটি বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোক দেবী 'ইশতার'-এর মন্দিরে বসে

থাকবেন এবং প্রথম যে পুরুষ এসে তাঁর কোলে একটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দেবেন তাঁর সঙ্গেই তিনি মিলিত হবেন। প্রাক্-বিবাহ বেশ্যাবৃত্তি এভাবে ব্যাবিলোনে মন্দিরকে সাক্ষী করেই শুরু হয়। মন্দির দাসীদের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস প্রাচীন ব্যাবিলোনে এভাবেই পাওয়া যায়।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ফিনিশীয়া খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে বাণিজ্য-শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন যুগ থেকেই ফিনিশীয়রা সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল। এদের কৃষিব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। প্রধান উৎপন্ন ফল ছিল আঙ্গুর। এই আঙ্গুরের মদ্য এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য নিয়ে ফিনিশীয় বণিকরা সমুদ্রপথে জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য শুরু করে এবং কয়েকটি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলির মধ্যে সাইপ্রাস, মাল্টা, সিসিলী এবং ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপসমূহ, থাসস্ ও রোডস উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে এদের স্থাপিত কার্থেজ নগরী পরবর্তীকালে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। কার্থেজের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে পিউনিক (Punic) ধর্ম বলা হয়। এই ধর্মে নরবলি ও শিশুবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। কার্থেজের প্রধান দেবী ছিলেন তানিথ। দেবী আইসিস ও ইশতারের মতোই এই দেবী ছিলেন শস্য ও প্রাচুর্যের দেবী। পরবর্তীকালে দেবী তানিথ গ্রীক পৃথ্বীদেবী সেরিস-এর সঙ্গে মিশে যান। পরে অবশ্য রোমান যুগে দেবরাজ্ঞী জুনোর সঙ্গে এই সমস্ত দেবী-কল্পনা মিশে যায়।

কার্থেজের মন্দির সম্বন্ধে মার্সাই নগরীতে প্রাপ্ত একটি মূল্যতালিকা পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে সে সময়ে মন্দিরে বলি দেবার জন্য পশুদের কিরকম দাম ছিল। এছাড়া মন্দির-বনিতাদের কথাও লেখা আছে। ফিনিশীয় মন্দিরসমূহে এই মন্দির নর্তকী বা দেবদাসীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল।

গ্রীসের ইতিহাসে আমরা দেবদাসীর উল্লেখ পাই নানা ভাবে। চিরতরুণ সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর মন্দিরে সর্বত্রই দেবদাসী নিযুক্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর পূর্বে ও পরেও সর্বত্র সূর্যদেবের দেবদাসী নিযুক্ত করা হয়েছে। গ্রীসের মন্দিরবালাদের বলা হতো Hierodule। এদের দেখা যেতো গ্রীসের প্রতিটি দেবমন্দিরেই। এদের কাজ ছিল দেবসম্মুখে নৃত্যগীত প্রদর্শন এবং বাধ্যতা-মূলক বেশ্যাবৃত্তি। প্রাচীন ব্যাবিলোনের 'ইশতার'-এর মন্দিরের দেবদাসীদের মতোই এদের কাজ ছিল প্রধানতঃ পুরোহিতদের এবং পরে রাজাদের ও ক্ষমতাশালী বীরদের মনোরঞ্জন করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যাপক চর্চা চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী করে তুলেছিল। সক্রেটিস, প্লেটো এবং আরিস্টট্ল দার্শনিক চিন্তার জগতে যে ব্যাপক মহিমার স্পর্শ দিয়েছেন, তা অদ্যাবধি গ্রীক সংস্কৃতিকে জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি হিসাবে মর্যাদা দিয়েছে। শিল্প, সৌন্দর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি সব দিক দিয়েই গ্রীসের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়রূপে স্বীকৃত। কিন্তু এই সভ্যতার পাদপীঠে দাস্যবৃত্তির যে সূচনা আমরা দেখতে পাই, তার কথা কেউই আলোচনা করে নি। পেরিক্লিস-এর সময় যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাকে সে সময় তো বটেই, পরবর্তী কালেও আদর্শ বলে মনে করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল। ৬০০০ সভ্যের সমবায়ে গঠিত haliaea বা জনসভা ছিল, তা আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগ পরিচালনা করতো। ৫০০ জন সভ্যের একটি কাউন্সিলও ছিল, তা রাজকার্যে রত কর্মচারীদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতো। তারও উপরে ছিল 'Board of strategoi', দশজন সভ্যসমবায়ে গঠিত। এ সভ্যরা নির্বাচিত হতেন ভোটের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে এ রকম গণতন্ত্র সর্বদেশে কাম্য। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক অধিকার কাদের জন্য ছিল? সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ, যে অংশ সমাজের উপরতলার অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত, তারাই এই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতো। দাসদাসীরা সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

এই দাসদাসী কারা? দিগ্বিজয়ী রাজন্যবর্গের পদানত দেশ থেকে নিয়ে আসা কৃতদাসবর্গ এই দাসদাসীদের প্রধান অংশ। এদেরই কেউ কেউ মন্দিরে নিয়োজিত হতো দাসীরূপে। এরা ছাড়া কাঞ্চনমূল্যে কিনে বা বল প্রয়োগে এদের সংগ্রহ করা হ'তো। অথবা রাজভয়ে গৃহস্থরা মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন করত মন্দিরে। ইতিহাস এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। আর্টেমিসের মন্দিরের দাসীরা বাধ্য হ'তো এক বিচিত্র জীবনযাপনে। পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অস্বাভাবিক জীবন ছিল তাদের। মদিরা দেব Bachhus-এর মন্দিরের দেবদাসীদের একটা বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা হতো। এদের বলা হতো Maenad—এদের সম্পর্কেও ইতিহাস নীরব। বালিকা অবস্থায় দেবদাসীদের তালিম দিয়ে তৈরী করা হতো এই Maenad হবার জন্য। এর সঙ্গে আমরা জানতে পারি Amazon-দের কথা। এই Amazon নারীরা ছিল যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিনী। ডান কাঁধে তূণ রাখার অসুবিধা ঘটায় ডান দিকের স্তনটিকে কেটে ফেলে বা শক্ত করে বেঁধে রাখতো বলে নাকি এদের নাম

হয়েছিল A-mazon বা একস্তনী। এদের সন্তান হতো, তবে কেবল কন্যাসন্তানকেই বাঁচিয়ে রাখা হতো। প্রজননের জন্য পুরুষ ধরে এনে সন্তান উৎপাদনের পর হয় তাকে বিতাড়িত করা হতো, নয় বধ করা হতো। কিন্তু এই Amazon-দের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রারও কোনো সামাজিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীমুক্তির আদর্শ বলে এদের মনে করাও অর্থহীন, কারণ যৌন অস্বাভাবিকতা কখনো মুক্তির প্রেরণা আনতে পারে না। যে সমস্ত বালিকাদের তালিম দিয়ে এই অস্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা হতো, তারাও দাসীই ছিল। Maenad বা Amazon-দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় নেই, তবু একথা মনে না করায় কোন বাধা নেই, যে দেবমন্দিরের সম্মান, যা তারা সে যুগে পেতেন, তার আড়ালে এই 'দেবদাসী'দের অসুস্থ জীবন মনোবিকারের শিকার হয়ে উঠেছিল।

গ্রীক সভ্যতার পরই রোমান সভ্যতার কথা আসে। রোম সাম্রাজ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে দাসসম্প্রদায়ের উপরই সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিল। কৃষি, শিল্প যুদ্ধ সবই করানো হতো এই দাসদের দিয়ে। এই দাস ও দাসীরা ব্যক্তিগত উপভোগের উপচার ছিল। দেবমন্দিরে প্রচুর দেবদাসী নিযুক্ত থাকতো, বিশেষতঃ দেবরাজ্ঞী জুনো এবং ভেনাস-এর মন্দিরে। দেবরাজ জিউস-এর মন্দিরেও দেবদাসী ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তবে এই দেবদাসীরা সকলেই ক্রীতদাসী ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ কোনো কোনো দেবদাসী বা নগরনটী সমাজের উচ্চ স্তর থেকেও আসতেন।

বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীনবৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সর্ব-প্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরদাসীরা যে কার্যতঃ পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্যপ্রমাণ আছে। তবে এই দেবদাসীদের পাশাপাশি রাজনটী ও নগরনটীদের আবির্ভাব ঘটেছে। সম্ভবতঃ দেবতার ভোগ এবং রাজা ও রাজপুরুষদের ভোগ সমপর্যায়ের হবে, এ ধারণাই ছিল এই প্রথার পিছনে। দেবদাসী ও নগরনটীরা সকলেই যে ক্রীতদাসী ছিলেন না, এ অনুমানের পশ্চাতে যে কারণটি দেখানো যায়, তা হ'ল ক্রীতদাসী এবং কৃতদাসী (যাকে যুদ্ধের ফলে দাসী করা হয়েছে)-দের কোনো রকম সামাজিক অধিকার ছিল না। কিন্তু নগরনটীদের সম্মান ছিল যথেষ্ট। এই নগরনটীদের গ্রীসে Hataera বলা হতো। এদের গৃহে দেশের জ্ঞানীগুণীরা আসতেন, নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন এবং এদের মতামতও সাগ্রহে শুনতেন।

থিওডোরা নামে বাইজেন্টিয়ান সম্রাটের পত্নী নিজে একজন Hataera ছিলেন। দেবদাসীদের সম্মানিত অস্তিত্বের প্রমাণও আছে, তবে তা Hataera-দের সমতুল্য নয়, কারণ তাদের কেন্দ্র করে ছিল ধর্মের পরিমণ্ডল।

গ্রীক Hataera-দের মতো জাপানে 'Geisha'-দেরও সামাজিক সম্মান যথেষ্ট ছিল। তবে এরা ছিল মুখ্যত আলাপচারিণী। সুন্দরী শিক্ষিতা Geisha-রা নাচ-গান করতেন এবং মৃদু মধুর আলাপচারণে শ্রোতৃবৃন্দকে মোহাবিষ্ট করতেন। পরে অবশ্য এ'রা সোজাসুজি বেশ্যাবৃত্তিতে যোগ দিয়েছেন। জাপানের মন্দিরের দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চীনের মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না, যদিও রাজসভা ও রাজপুরুষদের অন্তঃপুরে উপপত্নীরূপে নৃত্যগীত পটিয়সী রমণীদের বিপুল সমাবেশ ছিল। অনুরূপভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বলিদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশও নৃত্যগীত পটিয়সী বারাঙ্গনাদের বিপুল সমাবেশ ছিল। অবশ্য বলিদ্বীপের রাজপরিবারের মহিলারাও নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হতেন। এই নৃত্যগীত পটিয়সী রমণীদের অনেকে বারাঙ্গনা ছিলেন, অনেকে ছিলেন না। তবে দেবদাসী প্রথা এ সমস্ত অঞ্চলে ছিল কিনা সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা হয় নি এবং কোনো তথ্যও নির্ভরযোগ্যভাবে মেলে না।

দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেবদাসী প্রথার প্রমাণ পাই। ইনকা সম্রাট হুয়াস্কার এবং আটাহুয়াল্পার যুদ্ধ ইতিহাস বিখ্যাত। আটাহুয়াল্পা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুয়াস্কারের বধের আজ্ঞা দেন। পরে অবশ্য তিনিও পিজারো কর্তৃক হত হন। ইনকা সম্রাটরা সকলেই 'সূর্যের সন্তান' বলে পরিচিত ছিলেন। এ'দের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। এ'রাও মিশরের 'ফারাও' দের মতো সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করতেন। ইনকা রাজ্যে সূর্যের মন্দির তত্ত্বাবধানের কাজ করতেন পুরোহিতগণ। সুন্দরী মেয়েদের অল্প বয়সেই বেছে নিয়ে Cuzco বা শিক্ষালয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পরে হয় স্বয়ং রাজার উপপত্নী হিসাবে রাজাবরোধে প্রেরিত হ'তো অথবা 'সূর্যকুমারী' বা 'Virgins at the Sun' রূপে মন্দিরবাসিনী হ'তো। মন্দিরবাসিনী এই কন্যাদের কাজ ছিল পুরোহিত, রাজা বা রাজবংশীয় পুরুষদের মনোরঞ্জন এবং অন্যান্য শিল্পকাজ।

আজটেক সভ্যতার ইতিহাসেও সূর্য দেবতার আধিপত্য। সূর্যদেব অথবা Huitzilopochtli প্রতি সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন সকালে পুনর্জীবন লাভ করেন। এই দেবতার পুনর্জীবন ত্বরান্বিত করবার জন্য নরবলি

দেবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। Ahouritzotle-এর রাজত্বকালে ৮০,০০০ বন্দীকে বলিদান করা হয় এবং তাদের হৃৎপিণ্ড সূর্যের নিকট উৎসর্গ করা হয়। এ সভ্যতার ইতিহাসে নারীবলির প্রাধান্য। দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে নারী-মাংসের দৃষ্টিভোগের পাশাপাশি নারীবলিদানের এ ইতিহাসও লক্ষ্য করার মতো।

দেবদাসী প্রথার ইতিহাস এই সমস্ত দেশেই কিছুটা অস্পষ্ট সংবাদ ও কিছুটা অনুমান সাপেক্ষ। প্রাচীন যুগের ইতিহাস পৃথিবীর সর্বত্রই অনেকটা কিংবদন্তী নির্ভর। সে তুলনায় এই ধর্মীয় কুপ্রথার ইতিহাস সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, তার মূল্য কম নয়।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সময়টাকে ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তাতে ধর্মীয় সংগঠনগুলির ক্রমপরিবর্তনের ধারা যথেষ্ট কৌতূহলজনক। ক্রীতদাস বিদ্রোহের ফলেই রোমসাম্রাজ্যের পতন ঘটে, কারণ সমগ্র সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ছিল দৃঢ়শাসিত ক্রীতদাসবর্গের শ্রম, যে ক্রীতদাসরা প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে ক্রমশঃ ধৈর্যচ্যুত হচ্ছিল। Gracchi ও Spartacus-এর বিদ্রোহ যদিও কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল, তবু এই বিদ্রোহের ফলে রোমবাসী ও আশপাশের সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ ক্রমশঃ দানা বাঁধছিল। ধর্ম-জীবনের ক্ষেত্রেও মূর্তিপূজার আচার অনুষ্ঠান ও তার সঙ্গে বিলাসবিভবের বিভ্রম সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরোপলব্ধির আশ্বাস আর দিতে পারছিল না। রোম সম্রাটের দেবকল্প অপ্রতিহত ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মনে ক্রমশঃ বিতৃষ্ণাই জাগিয়ে তুলছিল। নবধর্ম প্রবর্তক যীশুখৃষ্টের বাণী ধীরে ধীরে পদদলিত সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। এই প্রভাব বিস্তৃত হয় নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেই, কৃষক, শ্রমিক ও ক্রীতদাস যার প্রধান অংশ। কালক্রমে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন। খ্রীস্টীয় ধর্মসংগঠন বা চার্চের উদ্ভব হলো। কালক্রমে চার্চই হয়ে উঠলো রাষ্ট্রীয় ধর্মসংগঠন। চার্চের প্রধান পুরোহিতকে দেওয়া হলো পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের ধর্মীয় সম্রাটের মর্যাদা, পাশে সম্রাটের মর্যাদা রইল কেবল শাসনকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। মন্দিরের বদলে চার্চের প্রাধান্য বাড়লো। চার্চে যোগ দিলেন যাঁরা, তারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই হলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পোপের আজ্ঞানুবর্তী। চার্চ সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠল। যে খ্রীস্টধর্ম দাসপ্রথাসংকুল রোম সাম্রাজ্যের ভিৎ নাড়িয়ে

দিতে চেয়েছিল, সেই খ্রীস্টধর্মই নতুন সমাজে শোষণের প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। চার্চের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও নানা কুপ্রথার প্রচলন শুরু হল। এই কুপ্রথা সম্বন্ধে পরবর্তী যুগের ফরাসী ও ইতালীর লেখকরা নানা মন্তব্য করেছেন। যদিও এই ধর্মসংগঠনে নারীর ভূমিকা অনেক উন্নত ছিল, তবু ধর্মীয় অনুশাসনের প্রচণ্ডতা সংগঠনভুক্ত নারীদের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে হরণ করে নেয়। মধ্যযুগের য়ুরোপে মন্দির দাসীদের একটা যুগ শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু দাসত্বের রূপ একেবারেই পালটে যায়।

প্রাচীন ভারতে দেবদাসী প্রথা

ভারতবর্ষে দেবদাসী প্রথার সূচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে চোখে পড়ে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর এক আশ্চর্য গুহালিপি। জনকতনয়ার স্নানপুণ্যোদকে অভিসিক্ত রামগিরি আশ্রমের (রামগড় পর্বত) পদতলে যোগীমারা গুহার গায়ে উৎকীর্ণ একটি লিপি যেদিন আধুনিক ইতিহাসবেত্তার চোখে পড়েছে, সেদিন লিপিতত্ত্বই একমাত্র প্রতিভাসিত হয় নি, এক ব্যর্থ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস সমাজবিধির এক অনপনেয় কলুষকে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল। লিপিটির নাম সুতনুকা লিপি, কোনো দেবদাসীর নামে রচিত,—

"সুতনুক নাম দেবদশিক্যি
তম্‌ অকাময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিন্নে নাম লূপদখে।..."

অর্থঃ—সুতনুকা নামে দেবদাসী। তাকে কামনা করেছিল বারাণসী বাসী দেবদিন্ন (দেবদত্ত) নামে রূপদক্ষ।

রূপদক্ষের রূপার্তি প্রশমিত হয় নি। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত সার্থক নাম্নী সুতনুকাকে নিষ্ফল কামনা করে আপন হৃদয়ের আকুল বেদনাকে লিপিবদ্ধ করে সে কোন্ সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল, কে জানে? এর ইতিহাস বেদনা-

করুণ। দেবতার নামে যতো অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে, নারীর অবমাননা। মহাকালের বজ্রসূচীতে তারই একটি প্রামাণ্য দলিল ধরা পড়ে গেল প্রস্তরপটে উৎকীর্ণ হয়ে! দেবদাসীর নিরুদ্ধ বেদনার সাক্ষ্য, রূপদক্ষের বেদনা-বিধুর ভালোবাসা মন্দিরভিত্তির পাষাণগাত্রে প্রতিহত হয়ে বিফল হয়েছে, কিন্তু মহাকাল তাকে আপন হাতে চিরজীবী করে রেখেছেন এই পাষাণগাত্রে!

যোগীমারা গুহাটি একটি আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চের মতো। এই গুহার অনতিদূরে সীতা বেঙ্গরা বা সীতা বেঙ্গা গুহাটিও অনুরূপ। রামগড়ের এই দুটি গুহা ছাড়াও নাসিকে নাচগানের জন্য ব্যবহার্য দুটি গুহা আছে। জুনাগড়ের উপরকোট গুহার দৃশ্যও একথাই প্রমাণ করে। কুদা ও মহাড় নামে দুটি গুহাতেও নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। এই গুহাগুলিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলির একটিতে (মথুরায়) একজন গণিকার দানের একটি ফিরিস্তি আছে। এই গণিকার নাম সম্ভবতঃ নাদা বা নন্দা। তিনি নিজেকে লেনশোভিকা দন্দার কন্যা বলে বর্ণনা করেছেন। লেনশোভিকা শব্দের অর্থ 'গুহাভিনেত্রী'। গুহাতে কেবল যে মুনিঋষিরাই বাস করতেন তা নয়, গুহা অনেক সময় যে নাট্যশালা রূপেও ব্যবহৃত হতো, তার প্রমাণ আছে। এই নাট্যশালাসংযুক্ত অন্যান্য গুহাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী, শোভিকা, গণিকা ইত্যাদি সকলেই থাকতেন। সম্ভবতঃ অভিনেতৃবৃন্দের একটি সুগ্রথিত 'গিল্ড' ছিল যার সঙ্গে এই অভিনেতা অভিনেত্রীরা যুক্ত ছিলেন। নৃত্যগীত পারঙ্গমা গণিকারাও সম্ভবতঃ এই ধরনের 'হোস্টেলে' বাস করতেন।

সীতাবেঙ্গা গুহাতে একটি খোদিত লিপি আছে, যার অর্থ,

"বসন্তে দোল পূর্ণিমার হাস্য ও উল্লাসচপল চন্দ্রিকাস্নিগ্ধ রাতে লোকে এরকম মোটা যুঁইফুলের মালা গলায় পরে।" এবং অন্য একটি লিপি যার অর্থ,—"সম্মানিত কবিরা স্বভাবতই তাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত করে, যারা…"

যোগীমারা গুহার সুতনুকা-লিপির সাহায্যেই দ্বিধাহীন ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই গুহামণ্ডবাসী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, বিশেষতঃ অভিনেত্রীরা দেবদাসী-পর্যায়ভুক্ত ছিলেন।

এই গুহাগুলির গঠন-প্রণালী বিচিত্র। সীতাবেঙ্গা গুহার ভিতরের দিক ছয় ফিট উঁচু। মাঝে ছয় ফিটেরও কম। গুহার একেবারে ভিতরের দেওয়ালের চারিপাশে উঁচু বেদী দিয়ে ঘেরা। একটা বড় নালী ঐ বেদীর নীচ দিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গেছে। মেঝের উপর বেশ যত্নসহকারে

কাটা কয়েকটি গর্ত। গুহার ভিতরে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া। গুহাটি সর্বসমেত ৪৪১ ফুট। দেওয়ালের চারদিকে পাথরকাটা উচ্চ মঞ্চাসন। এই মঞ্চাসনের সম্মুখবর্তী রঙ্গভূমিতে অভিনয়, নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য অনুষ্ঠিত হ'তো।

এই নাট্যকলায় অংশগ্রহণ করতো কারা? এ সম্বন্ধে নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হ'ল—

"নাট্যবেদ সংকলনের পর ব্রহ্মা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ দেবরাজ, ইতিহাস (দশরূপক) তো আমি সৃষ্টি করিলাম। এখন তুমি দেবগণের মধ্যে উহার প্রচার কর। যাঁহারা উক্ত বিদ্যা গ্রহণে ও ধারণে সমর্থ, উহাপোহ বিচার করিতে অপরাঙ্‌মুখ, লোক সমাজে ভীত নহেন—এইরূপ কুশল, বিদগ্ধ ও জিতশ্রম শিক্ষার্থিগণের মধ্যে এই নাট্যবেদ বিদ্যা তুমি বিতরণ কর।

ইহার উত্তরে ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! দেবগণ চিরদিন সুখভোগে অভ্যস্ত। নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান ও প্রয়োগ প্রভৃতি পরিশ্রমসাধ্য নাট্যকর্মে তাঁহারা কখনও সমর্থ হইবেন না। বেদের রহস্যবিৎ, কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রত নিয়ম পরায়ণ ঋষিগণই নাট্যবেদ শিক্ষা ও প্রয়োগ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

ইন্দ্রের এই যুক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণে কমলাসন ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তুমি শতপুত্র সহযোগে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ কর।' অনন্তর ভরত ব্রহ্মার নিকট যথাবিধি নাট্যবেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজ শতপুত্রকে নাট্যশিক্ষা দিলেন। অভিনয়ে যিনি যে ভূমিকার যোগ্য, তাঁহাকে সেই ভূমিকা প্রদান করা হইল। সর্বনাট্যের মাতৃকা স্বরূপিনী চারিটি বৃত্তির মধ্য হইতে তিনটি বৃত্তি বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেগুলি যথাক্রমে,

ভারতী—(পুরুষ-প্রযোজ্য বাক্-প্রধান বৃত্তি। করুণ ও অদ্ভুতরসে ব্যবহার্য)।

সাত্ত্বতী—(সত্ত্ব, শৌর্য, ত্যাগ, দয়া, ঋজুতা প্রভৃতি গুণ বর্ণনার উপযোগী) ও

আরভটী—(মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা ইত্যাদি)।

পিতামহ ব্রহ্মা ইহার সহিত কৌশিকী বৃত্তিও যোগ করিতে আদেশ দিলেন। উত্তরে ভরত বলিলেন, 'পিতামহ! কৌশিকী প্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ আমার অধিকারে নাই। শুধু অভিনেতার দ্বারা এটি চলিবে না।

অভিনেত্রীও চাই।' এই কথা শুনিয়া পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালংকার চতুরা অপ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন। এই অপ্সরাগণ ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি। ইহারাই ভারতের আদি অভিনেত্রী, আর ব্রহ্মার শতপুত্র হইলেন আদি অভিনেতা।"

এই অপ্সরাগণের নাট্যালংকার জ্ঞান সপ্তদশ প্রকার,—স্ত্রীলোকের স্বভাবজ দশটি অলংকার,—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত বিব্বোক, ললিত, বিবৃত।

অনয়জ অলংকার সাতটি—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুরী, ধৈর্য, প্রগল্ভতা ও ঔদার্য।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখতে পাই, অপ্সরাগণই প্রথম নৃত্যগীত ও অভিনয়ের দ্বারা দেবগণের মনোরঞ্জনে ব্রতী হন। গুহামণ্ডের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে স্বভাবতঃ মনে হয় যে, অপ্সরাগণ প্রকৃতপক্ষে মানবীই ছিল। এই নাট্যাভিনেতা ও নাট্যাভিনেত্রীরা সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত হতে পারেন নি। সে সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রেই একটি বর্ণনা আছে।

"সমগ্র নাট্যশাস্ত্র শ্রবণের পর আত্রেয়, বশিষ্ট, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ প্রীতচিত্তে সর্বজ্ঞ ভরতকে প্রশ্ন করিলেন, 'হে-বিভো। স্বর্গ হইতে নাট্য মর্ত্যভূমে কিরূপে সঞ্চারিত হইল? আপনার বংশই বা কি হেতু নটসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল?

উত্তরে ভরত বলিলেন—পুরাকালে আমার শতপুত্র নাট্যবেদ জ্ঞানে সদান্বিত হওয়ায় লোকের প্রহসন করিয়া বেড়াইতেন। কোনো এক সময় তাঁহারা দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঋষিগণের চরিত্রকে উপহাস করতঃ একখানি অতি অশ্লীল ও কুৎসিত দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ প্রকাশ্য সভায় করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—আমাদিগকে এইভাবে বিড়ম্বিত করা অত্যন্ত অন্যায়। যে জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া তোমরা দুর্বিনীত আচরণ করিতেছ,—তোমাদের সেই কুজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে তোমাদিগের ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ব্রহ্মচর্য্য—সকলই লোপ পাইবে,—শূদ্রাচার তোমাদিগকে আশ্রয় করিবে। তোমাদিগের বংশও শূদ্রবংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর তোমাদিগের বংশজাত স্ত্রী, বালক, কুমার, যুবা প্রভৃতি সকলেই নটনর্তক বৃত্তি অবলম্বন করিবে।"

নর্তক-নর্তকী সম্প্রদায় সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের এই মনোভাব ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে, তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রের ঐ উল্লেখ থেকে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নৃত্য, গীত ও অভিনয় যারা করতেন, কালক্রমে তাঁরা উচ্চবর্ণের মনোরঞ্জনকারী উপবর্ণে পরিণত হয়ে গেছেন এবং উচ্চবর্ণের মনোরঞ্জন করাই তাদের প্রধান উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত বর্ণ ও জাতি বিন্যাসে 'নট' গোষ্ঠীকে শূদ্র পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নটগোষ্ঠীর উল্লেখ মাত্র আছে। তবে নীচতম অন্তেবাসী জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ডোম ও শবর জাতিকে। এই দুই জাতির স্ত্রীপুরুষই নৃত্যগীতে পটু ছিল। সমাজের নিম্নতম স্তরে এদের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ ধর্মবিপর্যয়। বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভাগবত ধর্মের দ্বারা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, তখনই সমাজের উচ্চবর্ণের ক্ষমতাশালী লোকেরা উপজীবী বর্ণগুলিকে এইভাবে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। ভট্ট ভবদেবের রচিত স্মৃতি গ্রন্থটি এর প্রমাণ।

তবে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সময়ে, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতক থেকে প্রথম-দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে নটনর্তক সম্প্রদায়ের অবস্থা সামাজিকভাবে হীন হলেও তাদের প্রাধান্য নষ্ট হয় নি। অভিনয়শিল্পীদের সমাজে যথেষ্ট আদরণীয় বলে মনে করা হতো। নাটকের ব্যাপক প্রয়োগবিধি, অঙ্গহার ও করণ ইত্যাদির সুবিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারতের নাট্যশাস্ত্র একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ। নাটকের রচনা প্রয়োগবিধি, অভিনয়, গীত, বাদ্য-নৃত্য প্রভৃতি সবকিছুই সুনির্দিষ্ট ও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদিরও বর্ণনাও এতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্রানুযায়ী চেহারা, পরিচ্ছদ, প্রসাধন রয়েছে। অলংকার সব কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত। নাটকের নায়িকাদের করণ অঙ্গহার ও ভাববৈলক্ষণ্যের সুস্পষ্ট নির্দেশও আছে। একটি ছোটো উদাহরণ :

> 'বৈশাখ স্থানকেনেহ সর্বরেচক কারিণী।
> পুষ্পাঞ্জলি ধরা ভূত্বা প্রবিশেদ্র রাজমণ্ডপম্ ॥' —নাট্যশাস্ত্র

'হাতে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে বৈশাখ স্থানে অবস্থিতা সর্বরেচককারিণী নর্তকী রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবেন। তারপর তিনি (দেবগণের উদ্দেশ্যে) পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রঙ্গমঞ্চের চারিদিকে প্রণাম করে অভিনয় করবেন।'

নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভেই এই নাট্যকুমারীদের কথা ও অপ্সরাদের কথা বলা হয়েছে। এই নাট্যকুমারীরা একটা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, একথাও নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এরা যে একদল নারী অভিনেত্রী, এবং এদের যে কোনোভাবে সংগ্রহ করে অতি যত্নের সঙ্গে নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে

উপস্থিত করা হ'ত, তার বিশদ বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে আছে। এই ট্রেনিং বা শিক্ষা কারা দিতেন, সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে উর্বশী যখন পুরূরবার পত্নীত্ব গ্রহণ করে মর্তলোকে ছিলেন, তখন তিনি অন্তঃপুরিকাদের নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। উর্বশী পুরূরবার কথা ঋগ্বেদেও উল্লিখিত আছে। পুরাতত্ত্ববিৎ কীথ মনে করেন ঋগ্বেদের যুগে ধর্মীয় দৃশ্যাবলী অভিনীত হতো, ঐগুলিতে স্বর্গের ঘটনা মর্ত্যলোকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে পুরোহিতগণ দেবতা বা মুনিগণের ভূমিকা অবলম্বন করতেন।

রঙ্গমণ্ডপগুলি যে ধীরে ধীরে গুহামণ্ডের যুগ থেকে মন্দিরের সংলগ্ন নাট-মন্দিরে সরে আসছে, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ ও দাক্ষিণাত্যের রাজগণের ক্রমবর্দ্ধমান ঐশ্বর্য ও তার ফলে মন্দির নির্মাণের আতিশয্য দেখে। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরেই পরবর্তীকালে দেবসমক্ষে নৃত্যগীত ও অভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। অভিনেতৃবর্গ এই মন্দিরেরই অবশ্য পালনীয় ভৃত্যবর্গরূপে গৃহীত হ'তো। প্রসিদ্ধ তামিল নাটক 'শিলপ্পাদিকরম্'-এর কয়েকটি অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। এই নৃত্য দেবদাসী নৃত্য। এই নৃত্যের তাল, করণ, অঙ্গহার ও বিভিন্ন সুর সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা দেওয়া আছে। দাক্ষিণী কর্ণাটকী সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, নাট্য বা অভিনয়ের আঙ্গিক হিসাবে সঙ্গীতের আলোচনায়—রাগবিন্যাসের সুষ্ঠু রূপ নির্ণয় ও নিয়মন করার জন্য গ্রহ-ন্যাস অংশ ইত্যাদি দশটি লক্ষণ, বিভিন্ন অলংকার—এ সব কিছুই সঙ্গীতগুণী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে অনুসরণ করে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন। সমগ্র ভারতেই এই নৃত্য ও সঙ্গীত কলা পরিবেশিত হ'তো।

মন্দির-কেন্দ্রিক নৃত্য যে ক্রমশঃ গুহামণ্ডপগুলির ব্যবহার থেকে সরে এসে শুরু হয়েছিল, তার সম্বন্ধে প্রমাণ অনুমান নির্ভর। তবে শিল্পকলার ক্রমোন্নতি এবং রাজবৃত্তের ক্রমবিবর্তন যে শিল্পীগোষ্ঠীকে মন্দির-কেন্দ্রিক করে তুলেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরের সংগীতশিল্পী ও বাদ্যকরদের নাট্টুবান্ বলা হ'তো। নৃত্যকলা পরিবেশন করতেন দেবদাসীরা। দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি মন্দিরগাত্রে খোদিত নৃত্যরতা স্ত্রীমূর্তিগুলি এই দেবদাসী প্রতিমা। নৃত্যকলার অঙ্গহারগুলির বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমার বিন্যস্ত থাকতো! নাটমন্দিরে দেবদাসী যখন নৃত্য করতো তখন প্রতিটি নৃত্যের ভঙ্গিমা

সম্মুখস্থ মূর্তিতে খোদিত থাকতো বলে নর্তকীর কোনো ভুল হ'তো না। 'শিল্পপ্পাদিকরম্'-এ এই নৃত্যের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে।

এই দেবদাসী নৃত্য ছিল একান্তভাবেই মন্দিরের সম্পত্তি। নাট্যশাস্ত্রের প্রমাণ অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে, নৃত্যগীতের জন্য নির্দিষ্ট এই শ্রেণীটি সাধারণ শ্রেণী থেকে ভিন্ন। এই শ্রেণীর মেয়েরা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। তাদের জীবনযাত্রা যে সাধারণ গৃহবধূদের মতো স্বাভাবিক ছিলো, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। স্বর্গের অপ্সরাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যেটুকু প্রমাণ আছে, তাতে মনে হয় তাদের জীবনযাত্রাও সহজ ছিল না। ঋগ্বেদে 'উর্বশী পুরূরবা' সংবাদ বলে একটি ছোটো নাটক (?) বর্ণিত আছে। এই নাটকে উর্বশী পুরূরবাকে বলছেন,

> "তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে কী হবে ? তুমি নিজ গৃহে গমন কর। আমি প্রথম ঊষার ন্যায় চলে এসেছি। বায়ুকে যেমন ধরা যায় না, তেমন তুমিও আমায় ধরতে পারবে না !"
>
> পুরূরবার নির্বন্ধাতিশয্যে আরও বলছেন, "স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের (নেকড়ে বাঘ) ন্যায়।'—ইত্যাদি।

উর্বশীর মুখের এই কথাগুলি শুনলে বোঝা যায় যে স্বর্বেশ্যাদের অবস্থাও ছিল ক্ষণিক সুখ ও আনন্দের বিলাসদ্রব্য স্বরূপ মাত্র। দেবগণ এবং দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত রাজগণ এই স্বর্বেশ্যাদের সঙ্গ পেতেন এবং এই অপ্সরাসঙ্গ যথেষ্ট সম্মানজনক বলেই বিবেচিত হতো। মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যানে আমরা দেখি যে, অপ্সরা কন্যা শকুন্তলা রাজেন্দ্র দুষ্মন্তের মহিষী হয়েছেন। অন্যত্র, অর্জুনের আনন্দ বিধানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেছেন, যদিও অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সামাজিক বিধিবিধান অনুযায়ী স্বর্বেশ্যা অপ্সরাদের সঙ্গলাভে কোনো stigma বা কলঙ্ক আরোপ করা হয় নি। দেবদাসী প্রথায়ও এই ধারণাটিই স্পষ্ট দেখা যায়। মহাভারতে বারে বারেই অপ্সরাবৃত্তিকে ন্যায়সঙ্গত করার কাহিনী দেখানো হয়েছে। শকুন্তলার কাহিনী সর্বজনবিদিত। উর্বশীর পুত্র আয়ু পুরূরবার ঔরসজাত এবং রাজ্যাভিষিক্ত। অপ্সরাগণ বিভিন্ন সময়ে মুনিদের ধ্যান ভাঙানোর জন্য নিয়োজিত হয়েছেন, তার জন্য কোনো সামাজিক বাধা নেই। বরং এই ক্ষণমিলনজাত সন্তানরাও সমাজে সগৌরবে গৃহীত হয়েছে। দেবদাসীগণ দেবমূর্তির পত্নীস্বরূপ, সুতরাং তাঁদের সন্তানগণও সমাজে স্বীকৃত।

ভারতে দেবদাসী প্রথার উৎপত্তি কবে থেকে হয়েছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো

সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া কঠিন! নাট্যকুমারী বা performing artists হিসাবে নারীগণ নিযুক্ত হতেন, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই নারীগণ কীভাবে দেবদাসীতে পরিণত হলেন, তা বোঝা যায় না। এ সম্বন্ধে যেটুকু অনুমান করা যায়, তা হলো শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলি ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অবসরপুষ্ট ধনবান নাগরসমাজ ক্রমশঃ নানারকম বিলাস কলায় মগ্ন হতে থাকে। এই বিলাসকলার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল নারী। এই নারীগণ ছিলেন সুশিক্ষিতা, সুবেশা ও কামশাস্ত্রনিপুণা।

> "চতুঃষষ্টি কলায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া শীল, রূপ ও গুণান্বিতা বেশ্যা 'গণিকা' এই সংজ্ঞা লাভ করে এবং গুণগ্রাহিগণের সমাজে স্থান লাভ করে। রাজা সর্বদা তাহাকে সম্মান করেন, গুণবান ব্যক্তিগণ তাহার স্তুতিবাদ করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূত হইয়া থাকে।"

গণিকা সম্প্রদায় সম্বন্ধে এবংবিধ উক্তি সহজেই গ্রীক haetaera-দের কথা মনে করিয়ে দেয়। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের 'বসন্তসেনা' এই গণিকা চরিত্রেরই একটি প্রতিরূপ। বৌদ্ধযুগের সমকালীন তক্ষণ শিল্পেও দুটি উদাহরণ দেখা যায়। একটি চিত্রে নগরনটীর গৃহে পানোন্মত্ত নাগরিকদের জটলা, অন্যটিতে পানোন্মত্ত কতিপয় ব্যক্তি একজন গণিকাকে তাড়া করেছে এরকম বর্ণনা। বৌদ্ধযুগে এই গণিকা সম্প্রদায় যে যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ 'আম্রপালী'র কাহিনী। আম্রপালী সে যুগের প্রখ্যাত গণিকা ছিলেন। বিপুল দান এবং ত্রিরত্ন শরণ নেবার জন্য তিনি ইতিহাস-খ্যাত। কিংবদন্তী, তিনি বিম্বিসারের প্রণয়িনী ছিলেন এবং তাঁর ঔরসে একটি পুত্রেরও জননী হয়েছিলেন। 'মহাবস্তু অবদান জাতকের' শ্যামা-বজ্রসেনের কাহিনী বিশ্বকবির লেখনীতে অমর হয়ে আছে। 'জনপদ-কল্যাণী', 'শালবতী' ইত্যাদি বহু গণিকার নাম বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

দেবদাসীদের কিন্তু এই গণিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা যায় না। কারণ দেবদাসীদের ভূমিকা দেবমন্দিরকে কেন্দ্র করেই নির্দিষ্ট। এর কারণ হিসাবে নাট্যশাস্ত্রের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়।

> "A king's union takes place with a homely woman and a common man may unite with a public woman while the king may have union with a heavenly courtesan only."

এই heavenly courtesan বা অপ্সরাদের বাস্তব রূপায়ণ দেবদাসীদের

কেন্দ্র করেই ঘটেছে। সে জন্য দেবদাসীদের মর্যাদা অন্যান্য দাসদাসীদের চেয়ে তো বটেই, সুশিক্ষিতা বারমুখ্যাদের চেয়েও বেশী ছিল। এদের নিয়োগ করা হতো কেবলমাত্র কলাবিদ্যা শেখানোর জন্যই। কঠোর পরিশ্রমে তাদের অধিগত করতে হতো নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ পরিশ্রমে অধিগত শিক্ষার পর তাদের উপস্থিত করা হতো নাটমন্দিরে দেবতার সামনে, যেখানে অন্যান্য রসিকজনেরাও উপস্থিত থাকত। এখানে নৃত্যপ্রদর্শনের পর বিচারক স্থির করতেন কে রুদ্রগণিকা হবে, এবং কে রাজ-গণিকা হবে। রুদ্রগণিকা বা দেবদাসী হিসাবে যাঁরা মনোনীতা হতেন, তাদের মর্যাদা ছিল বেশী। শিল্পী হিসাবে তো বটেই, সামাজিক মর্যাদাও তাদের অলভ্য ছিল না। স্বয়ং রাজাও এদের প্রতি কামনাতুর দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে পারতেন না। সে অধিকার ছিল একমাত্র প্রধান পুরোহিতের।

'রুদ্রগণিকা' অভিধাটি পূর্বে সমস্ত অভিনেত্রীদের প্রতি প্রযোজ্য হতো। এই অভিধা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হ'ল :

> "শিব যে জাতির নায়ক ছিলেন সেই জাতির বৈদিক নাম রুদ্র। এ'রা ছিলেন দেবজন। মরুৎ, গণ প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী এই রুদ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নৃত্য ছিল এ'দের একটি বিশেষ অবসর বিনোদন। নানা রকমের নৃত্যচর্চা এ'রা করতেন, যেগুলির মধ্যে যৌথ ও একক নৃত্য উভয়ই প্রচলিত ছিল। এই রুদ্রদের প্রধান দেবতা শিব তারকাসুরের তিন পুত্র নির্মিত ত্রিপুর ধ্বংস করেন, এই 'ত্রিপুরদাহ' বা ত্রিপুর বিজয়গাথা অতিপ্রাচীন কালেই নাটকাকারে গ্রথিত হয়েছিল। কিন্নর রমণীরা এই গাথা গাইত, কালিদাস মেঘদূত কাব্যে তার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টির উপর একটি ভাব গম্ভীর নাটক রচিত হয় এবং তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেবতারাও তা প্রত্যক্ষ করেন।"

এ কাহিনী নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, ভরতপুত্রগণ শিবের নিকট করণ ও অঙ্গহার বিষয়ে উপদেশ নিতে গেলে শিব তাঁর অনুচর তণ্ডুকে এই অঙ্গহার ইত্যাদি শিক্ষা দিতে বলেন। এই অঙ্গহার ইত্যাদিই 'তাণ্ডব' নামে পরিচিত। এই তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের করণ ১০৮টি, অঙ্গহার ৩২টি। উপযুক্ত ভাবে প্রযুক্ত হলে আরো অনেক করণ আবিষ্কার করা যেতে পারে। এই তাণ্ডব নৃত্য কেবলমাত্র পুরুষদের আচরিত নৃত্য নয়। উচ্চ শ্রেণীর তাল-লয় সুর যুক্ত গীতবাদ্য ব্যতীত তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ভরত মুনি যে

নৃত্যধারাকে নাটকে মঙ্গলাচরণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সেটিই তাণ্ডববিধি নামে প্রচলিত ছিল।

দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ মন্দিরে এই তাণ্ডববিধি যাঁরা প্রচলন করেন এবং যে নর্তকীরা এই নৃত্য পরিবেশন করেন, তাঁরা 'রুদ্রগণিকা' নামে পরিচিত হন, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেবদাসী প্রথা এই 'রুদ্রগণিকা'দের নিয়েই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। নৃত্যকলাকে গভীর অনুধ্যান, অক্লান্ত অনুশীলন ও রূপায়ণের সাহায্যে অব্যাহত রাখার এই প্রচেষ্টা পুরোহিত ও রাজগণের সহযোগিতা লাভ করত। শিল্পচর্চার এই পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট মূল্যবান, তাতে সন্দেহ নেই, তবে, এই প্রথার অন্তরালে মেয়েদের অসহায় অবস্থারও যে সুযোগ নেওয়া হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ কেবল নৃত্যগীত শিক্ষা করা নয়, দেবগৃহের দাসীবৃত্তিও এদের কর্তব্য ছিল। দাসীবৃত্তি দুই ভাবে হতো। 'রঙ্গভোগ' ও 'অঙ্গভোগ'। রঙ্গভোগের অধিকারিণী যাঁরা তাঁরা ছিলেন নৃত্যগীতে দেবতার মনোরঞ্জনকারিনী। 'অঙ্গভোগ'-এর অধিকারিণীরা দেবমূর্তির অঙ্গসেবা করতেন। এই দ্বিতীয় স্তরের দেবদাসীরা নিতান্তই 'ভৃত্যা' শ্রেণীর। কালক্রমে এই 'ভৃত্যা' শ্রেণীর মেয়েরাই হয়ে পড়তেন বেশী অত্যাচারিত, কারণ দেবমূর্তির 'ভৃত্যার' পক্ষে পুরোহিতবর্গের 'ভৃত্যা' হয়ে পড়াটা অনিবার্য হয়ে উঠতো।

/ দেবদাসীদের আবার শ্রেণীবিভাগ ছিল। কীভাবে এবং সমাজের কোন্ স্তর থেকে এরা আহরিত হতো তার একটা ইঙ্গিত এই শ্রেণীবিভাগে পাওয়া যায়। দেবদাসীদের মধ্যে ছিল –

দত্তা—কোনো পুণ্যলোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মন্দিরে কন্যা দান করলে সে হতো 'দত্তা' দেবদাসী। উদাহরণ স্বরূপ, কবি জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতীর কথা উল্লেখ করা যায়। পদ্মাবতী নৃত্যগীতে সুনিপুণা ছিলেন বলে তাঁর পিতামাতা তাঁকে জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করেন।

হৃতা—যেসব মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেওয়া হতো। এই হরণ কার্য কার দ্বারা বা কার সহায়তায় (রাজা অথবা পুরোহিত) ঘটত তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

বিক্রীতা—মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রয় করলে সে বিক্রীতা দেবদাসীরূপে গণ্য হতো।

ভৃত্যা—যে দেবদাসী মন্দিরের কাজে ভৃত্যারূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য স্বেচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হতো সে ভৃত্যা।

ভক্তা—স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী সন্ন্যাসিনীকে ভক্তা দেবদাসী বলা হতো।

অলংকারা—নৃত্যগীত ও কলাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে নারীকে অলংকৃত করে দেবমন্দিরে অর্পণ করা হতো, সে অলংকারা। রাজকন্যারাও এভাবে মন্দিরে অর্পিতা হতেন।

গোপিকা বা রুদ্রগণিকা—এরা নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যগীত করার জন্য মন্দিরের বেতনভোগিনী দেবদাসী সম্প্রদায় রূপে পরিচিতা। /

ভারতীয় মন্দিরের দেবদাসীদের সম্বন্ধে আলবেরুনী (আনুমানিক ১০৩০ খ্রীঃ) এবং ইদ্রিশী বলেন—

"The Hındus are not very severe ın punishing whoredom. The fault however, in this lies with the kings, not with the nation. But for this, no Brahman or priest would suffer in their idol-temples the women who sing, dance and play. The kings make them an attraction for their cities. a bait of pleasure for their subjects, for no other but financial reasons"

আলবেরুনীর এই মন্তব্যটি লক্ষ্য করার মতো। তবে কেবল রাজা স্বয়ং যে ব্রাহ্মণদের বিরক্তিভাজন হয়ে এই প্রথা চালু রেখেছিলেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। একাদশ শতাব্দীতে যে অবস্থা আলবেরুনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সূচনা হয়েছিল বহুকাল আগেই. প্রায় প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে যার প্রথম ইঙ্গিত পাই খ্রীস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে যোগীমারা গুহালিপিতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে যোগীমারা গুহালিপির সুতনুকার উল্লেখই সর্বপ্রথম দেবদাসীর উল্লেখ। কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, দেবদাসী প্রথা তার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুত পুরাণের অপ্সরা পরিকল্পনা দেবদাসী প্রথারই ইঙ্গিত দেয়। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য যে পূর্বানুপরভাবে রয়েছে, তা বলা চলে না। বৌদ্ধ যুগে যে দেবদাসী প্রথা ছিল, তা অনুমান করা যায়। তবে বৌদ্ধ যুগে 'গণিকা' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী। মৌর্য যুগ সম্বন্ধে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'গণিকা'দের উল্লেখ আছে। এই গণিকাদের উপার্জিত অর্থ রাজকোষে গৃহীত হতো। এ ছাড়াও 'রূপাজীবা'দের একটা বড় অংশ রাজার গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতো। মন্দিরের দেবদাসী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে স্পষ্ট

কোনো উল্লেখ নেই। বৌদ্ধ জাতকসমূহে এই রূপাজীবা নর্তকী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু কাহিনী রয়েছে।

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতেও রূপজীবা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কঠোর তপস্যা জৈনধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল। জৈন সন্ন্যাসীবর্গের পদস্খলনের ইতিবৃত্ত-সমূহে 'রূপাজীবা'দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি রয়েছে। তবে 'স্থূলভদ্রা' প্রমুখ বারনারীদের ধর্মপথে প্রবৃত্ত হওয়ার কাহিনী যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

অবশ্য নৃত্যকলা বিশেষজ্ঞ নর্তক-নর্তকীদের কথাও বলা হয়েছে রায়পসে-নীয় সূত্রে ঃ—মহাবীরের সম্মুখে নৃত্যের জন্য আহূত হয়ে নট ও নটীরা বত্রিশ রকমের ভঙ্গীতে নৃত্য প্রদর্শন করেছিল। সুপুরুষ তরুণ নর্তকগণ একদিক থেকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছে, তাদের পরিধানে অধোবাস, কটিদেশে বিচিত্রবর্ণ পট্টিক, উত্তরবাস হিসাবে কেবল উত্তরীয় এবং কণ্ঠেমাল্য ও অন্যান্য অলংকার। আর এক দিক থেকে নর্তকীরা প্রবেশ করছে, তাদের ললাটে তিলকরেখা, সর্বাঙ্গ অলংকারভূষিত, শিরোদেশে রত্নহার এবং বক্ষে বিচিত্র স্তনপট্ট।

এই নর্তকীরা বাহাত্তর প্রকারের কলানিপুণা ছিলেন বলে জৈন সাহিত্যে কথিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বাৎসায়ন রচিত কামসূত্রে চৌষট্টি প্রকারের কলার কথা বলা হয়েছে। এই চৌষট্টি কলা যথাক্রমে ঃ—গণিত, রূপম্, নৃত্যম্, গীতম্, বাদ্যম্ স্বরগতম্, পুষ্করগীতম্ (আশু কবিতা), উদকমৃত্তিকা, অন্নবিধি, পানবিধি, বেশবিধি, শয়নবিধি, বিলেপন বিধি, আর্য্যা, পহেলিয়ম্ (ধাধা) মাগধীয়ম্, গ্রহম্, শ্লোকম্, গীতিকা, হিরণ্যযুক্তি, চূর্ণযুক্তি আভরণবিধি, তরুণী পড়িকাম্মা (তরুণী আকর্ষণ), সামুদ্রিক শাস্ত্র, হয়লক্ষণ ইত্যাদি পশু পশুলক্ষণ নির্ণয়, ছত্রদণ্ড লক্ষণ, অসিলক্ষণ, মণিলক্ষণ, কাগনীলক্ষণ (বিষ লক্ষণ), বাস্তুবিদ্যা, স্কান্ধাবারমলম্, নগরমানস, চার প্রতিচার (গুপ্তচর বিদ্যা) ব্যূহ প্রতিব্যূহ, চক্রব্যূহ গরুড়ব্যূহ, শকটব্যূহ, যুদ্ধ, নিযুদ্ধ (কুস্তি) যুদ্ধাতিযুদ্ধ, দৃষ্টিযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, লতাযুদ্ধ, ইষ্টশাস্ত্র (বাণ-নির্মাণ), হিরণ্যাপক, সূত্রখেলম্, পত্রচ্ছেদ্যম্, কটচ্ছেদ্যম্, সজীব-নির্জীব, শাকুনশাস্ত্র, অসিবিদ্যা, ইত্যাদি।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই চৌষট্টি প্রকার কলার অধিকাংশ যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত। সুতরাং নর্তকীদের পক্ষে এর সবগুলি শেখার সুযোগ নাও থাকতে পারে। যাই হোক, 'কামসূত্রে' এই বারাঙ্গনা নর্তকীদের কথা বিশদ-ভাবে বলা হয়েছে।

গুপ্তযুগে নর্তকীদের সম্বন্ধে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবদাসীদের সম্বন্ধেও আলাদা বর্ণনা পাওয়া যায় 'মেঘদূতে' ও অন্যান্য কাব্যে। একটি উদাহরণ,—

"পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ।
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদ সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু।
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥"

"সেই মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করে, মহাকালকে চামরব্যঞ্জন করে; তালে তালে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মেখলার ঝংকার ওঠে; তারা ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করে। সেই চামর বিচিত্র রত্নখচিত; ক্রমে তাদের হস্ত ক্লান্ত হয়ে আসে। প্রিয়তমের নখক্ষতযুক্ত অঙ্গবিশেষে তোমার বিন্দু বিন্দু বর্ষণ পেলে তারা তৃপ্ত হয়ে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে, মনে হবে যেন অসংখ্য ভ্রমর তোমার দিকে ছুটে আসছে।"

দামোদরভট্টের কুট্টনীমতম্-এ নানা বর্ণনা রয়েছে।* মঞ্জরী সম্বন্ধীয় একটি কাহিনীতে আছে, বারাণসীর গম্ভীরেশ্বর মন্দিরে গিয়ে জনৈক যুবক মন্দিরের বারাঙ্গনাদের সঙ্গে আলাপ করছেন। এক ব্যক্তি জনৈকা বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করছে, "তোমার ঐ বন্ধুটি কি গম্ভীরেশ্বরের দেবদাসীর প্রেমে পড়েছে? তাহলে তিন বৎসরের মধ্যেই বেচারির দুঃখের সীমা থাকবে না।"

ক্ষেমেন্দ্র তাঁর গ্রন্থে কাশ্মীর অঞ্চলের বারাঙ্গনাদের সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।** এই বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন নাগর সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। এই নাগরসংস্কৃতি অবসরপুষ্ট নাগরিকবৃন্দের বিলাসকলাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করেছিল।

---

* তিনি বলেছেন যে, দেবদাসীরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা পেতেন, তাই তাঁদের আয় ছিল এবং এই জীবিকা ছিল বংশানুক্রমিক বা ক্রমোপগত। (ত্রিদশালয়জীবিকাম্)।

** ক্ষেমেন্দ্র তাঁর সময়মাতৃকা গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন যে দেবদাসী দেবালয়ে তার কর্মের জন্য শস্য প্রাপ্ত হয় মজুরী হিসাবে। মন্দিরগুলিতে একাধিক দেবদাসী ছিল. তারা ক্রমান্বয়ে নৃত্যগীত করতো। 'শৃঙ্গারমঞ্জরী' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে লাবণ্য সুন্দরী নামে এক সুন্দরী দেবদাসী নৃত্যপ্রদর্শনে তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যারম্ভ করছে।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে পহ্লব রাজ্ঞী ধর্মমহাদেবী চুয়াল্লিশজন দেবদাসীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষদের কাছ থেকে বেতন পেতেন।

বাংলা দেশে পাল যুগে দেবদাসী প্রথার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে রামাবতী নগরীর মন্দিরের দেব বারবণিতাদের রূপলাবণ্যের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এছাড়াও সদুক্তি কর্ণামৃতের টুকরো টুকরো শ্লোকে সুন্দরী বারাঙ্গনাদের বর্ণনা আছে।

"বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীঃ।
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গ বারাঙ্গনানাম্ ॥"

"দেহে সূক্ষ্ম বসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার আকারে বাঁধা তাহাতে ফুলের মালা জড়ানো। কানে নবশশিকলার মতো নির্মল তালপত্রের আভরণ—বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করিয়া থাকে ?"

বাংলা দেশে দেবদাসী প্রথার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টম শতকে কল্হনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে নর্তকী কমলার প্রসঙ্গে। কমলা পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরের প্রধানা নর্তকী ছিলেন। দেবদাসীরা সকলেই নানা কলা-বিদ্যায় নিপুণা ছিলেন, কমলা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আরো উচ্চস্তরের। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিজয়াদিত্য এই কমলাকে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্রয় করেন বহু অর্থব্যয়ে। ধোয়ীর পবনদূতে বাররামাদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই বাররামাগণ সকলেই মন্দির-নর্তকী ছিলেন। ধোয়ী এঁদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুহ্মদেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাঁহার পতি মুরারির পাশে।"

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিও এই দেবদাসী প্রথার ব্যাপকতার ইঙ্গিত দেয়। কবি উমাপতি ধর এই দেওপাড়া প্রশস্তির রচয়িতা। এই প্রশস্তি বাক্যে বলা হয়েছে বিষ্ণু-মন্দিরের উৎসর্গীকৃত দেবদাসীরা যেন রূপ ও সৌন্দর্যের দ্বারা কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতেও এই কথাই বলা হয়েছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "পাল আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না ; পরে দক্ষিণী প্রভাব সেন বর্মণ আমলে বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং দেবদাসী প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়। অবশ্য এই প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল নগর সমাজে। এই প্রথা প্রচলনের অন্যতম

কারণ হিসাবে বৌদ্ধ মতবিরোধিতা ও ভাগবত ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াসকেও নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।'

গোবর্ধন আচার্যের আর্য্যসপ্তশতী, হালের গাথা সপ্তশতী ও সদুক্তি কর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকরাজি, সবগুলিই সমকালীন অবসরপুষ্ট নাগরসমাজের বিলাস-লীলার ব্যাপক প্রচলনের উল্লেখে সমাকীর্ণ। কবি জয়দেব এই কবিসমবায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত ও স্বীকৃত। তাঁর গীতগোবিন্দের মধুরকোমলকান্ত পদাবলী যে কতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ, উড়িষ্যার রাজা নাকি ঘোষণা করেছিলেন যে, মন্দিরে জয়দেব গোস্বামীর রচনা ছাড়া অন্য কোনো গান গাওয়া হবে না। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী নৃত্যগীত নিপুণা ছিলেন এবং তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দেবদাসী ছিলেন। দেবতার আদেশে তাঁর সঙ্গে জয়দেবের বিবাহ সংঘটিত হয়। পদ্মাবতীর গীতবাদ্যে নিপুণতার দুটি সুন্দর কাহিনী সেকশুভোদয়া নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কাহিনীটি এই,—

"একদা বুঢ়নমিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় এসে রাজাকে গান শোনাতে চান। রাজা সানন্দে রাজি হন। বুঢ়নমিশ্র পটমঞ্জরী রাগ গাইলেন, ফলে আশপাশের সমস্ত গাছ নিষ্পত্র হয়ে গেল। রাজা গায়ককে জয়পত্র লিখে দিতে উদ্যত হলেন। ইতিমধ্যে সখীসহ স্নানে যাবার পথে পদ্মাবতী এই বার্তা শুনে স্বয়ং রাজসভায় গেলেন, এবং গিয়ে বললেন, 'আমি ও আমার স্বামী থাকতে বাইরের লোক এসে জয়পত্র নিয়ে যাবে কেন?' বলে, নিজে গান গাইতে বসে গান্ধাররাগ আলাপ করলেন। এই রাগে আকৃষ্ট হয়ে নদীতে যত নৌকা ছিল সবই তীরে এসে দাঁড়ালো। সভায় স্থির হলো পদ্মাবতীই শ্রেষ্ঠা, কারণ সজীব বৃক্ষ-গান শুনে পত্রমোচন করেছে। কিন্তু নির্জীব কাঠও যখন আকৃষ্ট হয়েছে, তখন পদ্মাবতীই শ্রেষ্ঠা। ক্ষুব্ধ গায়ক বুঢ়নমিশ্র মন্তব্য করলেন 'এদেশে স্ত্রীলোকই অধিক গুণবতী'। শুনে পদ্মাবতী দাসী পাঠিয়ে জয়দেবকে আহ্বান করলেন। জয়দেব মিশ্র এসে সব শুনে বললেন, 'পাতা ঝরে যেতেই পারে, কারণ বসন্তকালে পাতা ঝরে।' বুঢ়নমিশ্র আপত্তি তুললেন, 'এক সঙ্গে তো সব পাতা পড়ে না, দিনে দিনে পড়ে।' জয়দেব বল্লেন, 'তবে পাতা ফিরিয়ে আনুন।' মিশ্র বললেন, 'তা পারি না'। তখন জয়দেব বসন্ত রাগ আলাপ করলেন, সমস্ত গাছের পাতা সবুজ হয়ে গজিয়ে উঠল।"

কাহিনীটির মধ্যে পদ্মাবতীর কলানৈপুণ্যের কথা উল্লিখিত থাকায় বিশদ-ভাবে বর্ণনা করা হলো। এরূপ কলানৈপুণ্য দেবদাসীদের সকলেরই ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় সোমবংশীয় নরপতি কর্ণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করতেন। কর্ণরাজের রত্নগিরি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর রানী কর্পূরশ্রী সলোন-পুরের বৌদ্ধমন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। কর্পূরশ্রীর মাতা মাহুণ দেবীও 'মহারি' অর্থাৎ দেবদাসী। কর্পূরশ্রীর কোন পিতৃপরিচয় উল্লিখিত নেই, সাধারণতঃ দেবদাসীকন্যাদের পিতৃপরিচয় থাকতো না। অবশ্য সমাজে এঁদের স্থান বিশেষ মর্যাদাময় ছিল। রাজকুললনারাও এই দেবদাসীদের সান্নিধ্যে নৃত্যগীত শিক্ষা করতেন। বারাঙ্গনার অর্থসামর্থ্য যথেষ্ট ছিল নিশ্চয় কিন্তু সামাজিক সম্মানের দিক থেকে দেবদাসীরা ছিলেন অনেক উচ্চে। উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের মেঘেশ্বর লিপিতে (১১৯০—১১৯৮) দেবদাসীদের কথা উল্লিখিত আছে। স্থপতি কোলবতী কর্তৃক ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত করা হয়েছিল। লিপিকার উদয় তাঁর কবিসুলভ ভাষায় বলেছেন,

"শিবমন্দিরে তিনি (রাজা) অপ্সরাতুল্যা দেবদাসীদের উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের অধরে সুধা, কটাক্ষে কাম এবং অঙ্গে মোহন ও স্তম্ভন বিরাজ করতো।"

কেবল উড়িষ্যায় নয়, কর্ণাটকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ইত্তাগীতে চণ্ডালেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নানা দেশ থেকে সুন্দরী নারীদের এনে সেখানে দেবদাসীরূপে নিযুক্ত করেন।

পহ্লবী লিপিগুলিতে দেবদাসীদের ব্যাপক উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্যে দেবদাসী কন্যাগণ সমাজে সহজ ভাবেই বিবাহিতা হতে পারতো। পারভইয়ার নামে এক 'রুদ্রগণিকা'র কন্যা সুন্দর মূর্তি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিতা হয়েছিলেন। চোল রাজগণের যুগে এই দেবদাসী প্রথা সুসংগঠিত ছিল। একাদশ শতকে রাজরাজ চোল অন্যান্য মন্দিরের দেবদাসীদের শ্রীরাজরাজেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসেন। এই দেবদাসীরা খাদ্যশস্য বেতন হিসাবে লাভ করতো। এদের অন্যত্র সরালেও এদের আত্মীয়রা পূর্বের বেতনই ভোগ করতে থাকতো।

ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং অন্যান্য রাজ্যেও দেবদাসী প্রথার ব্যাপক অস্তিত্ব দেখা যায়। এই প্রথার ব্যাপক অস্তিত্বের পাশাপাশি বারবণিতা বৃত্তির প্রসারও ব্যাপক। বেশ বোঝা যায়, বারবণিতাদের মত দেবদাসীরা অর্থ উপার্জন করতে পারতেন না। তবে বারবণিতাদের, সমাজের কলঙ্ক হিসেবে

দেখা হতো, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের পর। দেবদাসীদের সামাজিক কলঙ্কের বোঝা বইতে হতো না, বরং সমাজে তাঁদের মর্যাদা ছিল অনেক উচ্চে। এদের পরিবারবর্গও এদের উপার্জনের দ্বারা প্রতিপালিত হতো।

তবু যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যায়, তা হল, সমাজের কোন্ শ্রেণী থেকে দেবদাসী সংগ্রহ করা হতো? এর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। পদ্মাবতী, কর্পূরশ্রী বা মাহ্ণ দেবী এই রকম দু-চারজন হয়তো সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবদাসীরা—দত্তা, অলংকারা ও হৃতা দেবদাসীগণ সমাজের নিম্নস্তর থেকে আসতেন মনে করা অসঙ্গত হবে না। বর্ণবিন্যাস অনুযায়ী নটনর্তক সম্প্রদায় যে নিম্নবর্ণের ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ডোম, শবর, মতঙ্গ, মাঙ্গ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের বহু জাতি অদ্যাবধি নৃত্যগীতে পারদর্শী। এবিষয়ে চর্যাপদে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ আছে। যদিও গোপন ধর্মাচার বর্ণনার জন্যই এই পদগুলি রচিত, তবু এদের মধ্যে সমকালীন জীবনচর্যার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"এক সে পদুমা চোষট্ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।"

অথবা

"বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধ্বনি বিলসই রুণা॥
... ...
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥"

এই সমস্ত বর্ণের মেয়েরা যে দেবদাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত হতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও অনুমান করা যায়, নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী মেয়েদের যে কোনো উপায়ে সংগ্রহ করে তাদের দেবদাসীরূপে উৎসর্গ করে উচ্চবর্ণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা হতো।

দেবদাসী প্রথার পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিশ্লিষ্ট তথ্যের সম্মুখীন হই। প্রথমত, অভিনেতা—অভিনেত্রীদের অন্তর্গোষ্ঠী এবং সেই অন্তর্গোষ্ঠীর কঠিন শৃঙ্খলা, যা কালক্রমে মণ্ডকেন্দ্রিক গঠনের অঙ্গীভূত হয়ে দেবমন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বিপুল বিলাসকলার ব্যাপকতা সমাজে বারাঙ্গনা বৃত্তিকে প্রসারিত করেছিল এবং দেবমন্দিরের নর্তকীরাও নানাভাবে এই বারাঙ্গনা

বৃত্তিতে কিছুটা যুক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। প্রধানত, রাজগণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারের ফলেই এ ঘটনা ঘটেছিল।

তৃতীয়ত, সমাজের কয়েক ক্ষেত্রে এই বৃত্তি সম্মানিত ছিল এবং দেবদাসী কন্যার বিবাহ সাধারণ সামাজিক ব্যক্তির সংগে হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তই অবশ্য দেবদাসীদের মর্যাদাময় জীবনযাত্রার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর দেবদাসী প্রথা ক্রমশঃ মন্দিরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। নগরনটীদের মর্যাদা, যা একদা দেবদাসীদের সমস্তরের ছিল, তা ক্রমশঃ কমতে থাকে। বাংলা দেশে দেবদাসী প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা চতুর্দশ শতক থেকে একেবারে দেখাই যায় না। এই অবস্থার কারণও বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য।

দেবদাসীদের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে দেবদাসী সংগ্রহের রূপরেখা। রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র কীভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে, তার প্রমাণ যথাক্রমে, 'হৃতা' ও 'দত্তা' পর্যায়ে পাওয়া যায়। সমাজ-ব্যবস্থায় রাজশক্তির এই প্রয়োগ এবং পুরোহিততন্ত্রের কঠোর শাসন দেবদাসীদের কীভাবে সাক্ষাৎ প্রহরাধীনে রাখতো, তার টুকরো টুকরো বর্ণনাও পাওয়া যায়। সাধারণ বারাঙ্গনারা ছিলেন জনসাধারণের যথেচ্ছ ব্যবহার্য সম্পত্তি, কিন্তু দেবদাসীরা ছিলেন সুরক্ষিতা, সাধারণ লোকের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌পট

বাংলা দেশে দেবদাসীপ্রথার ঐতিহ্য বিলুপ্তির একটা বড়ো কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এছাড়া বাংলা দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তি দেবদাসী প্রথা বিকাশের প্রতিকূল ছিল। বাংলা দেশের অধিবাসীর জাতিপরিচয় বিচিত্র। যে যুগে আমরা দেবদাসীপ্রথার অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, সে যুগ হলো আর্যীকরণের যুগ। এই আর্যীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো দেবমূর্তি সংস্থাপন এবং তার ভোগব্যবস্থা। বাংলা দেশে এই আর্যীকরণ স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নি। সে জন্যই আমরা বাংলা দেশের অভ্যন্তর ভাগে এই প্রথার, অর্থাৎ নৃত্য গীত ব্যবসায়ী মন্দিরবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত দেবদাসী প্রথার পরিচয় ব্যাপক ভাবে পাই না। অথচ বাংলা দেশের অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যায় এই প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরের তৎকালীন দেবদাসী-কে অনুগ্রহ করে ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তার উল্লেখ আছে। অদ্যাবধি দেবদাসী পদ জগন্নাথ মন্দিরে যথেষ্ট সম্মানিত পদ। রথযাত্রা উপলক্ষে দেবদাসীর উপস্থিতি অবশ্য কর্তব্য, রাজপরিবারের বিবাহ উৎসবেও তাই। বর্তমানে এই দেবদাসী পদ পরিবার ভিত্তিক, অর্থাৎ নীলমাধবের পূজারীবৃন্দের পরিবার থেকেই এরা সংগৃহীত হয়, অথবা প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী কাউকে নির্বাচন করা হয়। উড়িষ্যা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-ভারতের সকল জায়গাতেই এই একই প্রথা অনুসৃত। তবে বর্তমানে রঙ্গমঞ্চ ও সাধারণ নৃত্যশালার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় মন্দির—নর্তকী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অন্তর্গোষ্ঠী মধ্যযুগের রাজপ্রসাদলগ্ন সঙ্গীতগুরুদের মতো বিশিষ্ট 'ঘরাণা'য় পর্যবসিত হয়ে গেছে। 'ওড়িশী' নৃত্যকলার অধিকারিনী ছিল একদা একমাত্র দেবদাসীরাই,

'মহারি' বলে যারা পরিচিত। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজসভার নর্তকীরাও এ নৃত্যপ্রদর্শনের অনুমতি প্রাপ্ত হতেন, তবে বর্তমানে 'ওড়িশী' নৃত্যশিল্পীরা সকলেই যে 'মহারি' শ্রেণীভুক্ত, তা নয়। রাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল শিল্পী-গোষ্ঠী এখন শিক্ষিত নগরবাসী জনগণের রুচির পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকতর আস্থাবান। ফলে দেবদাসী প্রথার সাংস্কৃতিক দিকটি এখন মন্দিরকেন্দ্রিক প্রথা বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ নেই, তা এখন অন্যান্য প্রচার মাধ্যম, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ইত্যাদির সাহায্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। মন্দিরকেন্দ্রিক অন্তর্গোষ্ঠী গুলি এখন নিতান্তই ধর্মীয় সংস্কারের আচারে আবদ্ধ। দেবদাসীবৃত্তির অন্য দিকটি অর্থাৎ বারাঙ্গনাবৃত্তি, এখন সোজাসুজি মন্দিরের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার সূচনা একদিনে হয় নি। প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনার পশ্চাৎপট রূপে যে সমাজব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে, তার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেবদাসী প্রথার বর্তমান রূপ ও তার পরিবর্তনের কারণটি ধরতে পারব। আদি ও মধ্যযুগের জীবনচর্যার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সাধারণ মানুষের স্থান বেশি নয়। তৎকালীন কাব্য, চিত্র বা কাহিনীতে সাধারণ মানুষকে আমরা স্পষ্ট করে পাই না। সদুক্তি কর্ণামৃতে'র দু-একটি পদে অবশ্য সাধারণ মানুষের কিছু পরিচয় আছে। প্রাচীন যুগেও অত্যাচার ছিল, দারিদ্র্য ছিল, দুঃখ-বেদনা ছিল। জানা-অজানা কবির কাব্যে নিম্নবর্ণের মানুষের দারিদ্র্যের এবং দুঃখ-বেদনার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তান তৃণ সঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থি মণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥

অর্থ: কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে। কেঁচোর সন্ধানে ব্যাঙ ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার জীর্ণ গৃহে।

দরিদ্র গৃহিণীর বাস্তব চিত্র এঁকেছেন কবি,—

বৈরাগ্যৈক সমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।
দীনা দুঃস্থ কুটুম্বিনী পরিগলদ্ বাষ্পাম্বুধৌতাননা—
প্যেকং তণ্ডুল মানকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি।

অর্থ:—নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধার শিশুদের চোখ ও পেট বসে গিয়েছে, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন

একমান (ধামা) তণ্ডুলে একশত দিন চলে যায়।

আর একটি মর্মান্তিক চিত্র—

> ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশব শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
> লিপ্তা জর্জ্জরকর্করী জললবৈর্ণো মাং তথা বাধতে।
> গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়তুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
> কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা।

অর্থ—শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-বন্ধু বিমুখ, পুরানো গাড়ুতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে,—এ সকল আমাকে তত কষ্ট দেয় নি, যত কষ্ট দিয়েছিল গৃহিণী যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বার বার রুষ্ট প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ চাইছিল, তা দেখে।

শরণাচার্যের একটি শ্লোকে আছে গ্রামবধূদের ঘরে ফেরার চিত্র ;

> এতাস্তা দিবসান্ত ভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
> স্কন্ধ প্রস্খলদংশুকাঞ্চল ধৃতি ব্যাসঙ্গ বদ্ধাদরাঃ।
> প্রাতর্যাত কৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
> হট্ট ক্রয্য পদার্থ মূল্যকল নব্যাগ্রাঙ্গুলি গ্রন্থয়ঃ ॥

অর্থ—মেয়েরা দ্রুত চলেছে, তাদের চোখ সন্ধ্যাসূর্যের মত অরুণ, ছুটে যাবার জন্য মাথার আঁচল বার বার খসে পড়ছে, তা তুলে দেবার জন্য তাদের আগ্রহ, চাষী সকালে বেরিয়ে গেছে, তার ফেরবার সময় হয়ে আসছে ভেবে তারা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করছে, হাটে বেচাকেনার দাম আঙ্গুলে গুণতে ব্যস্ত।

এই চিত্রের পাশাপাশি নাগরিকাদের চিত্রও আছে, যা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

> বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রী
> মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
> কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
> বেশঃ কেষাং ন পুরতি মনো বঙ্গ বারাঙ্গনানাম্ ॥

অর্থ—দেহে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার অঙ্গদ, গন্ধতৈলে সিক্ত ও মসৃণ করে আঁচড়ানো কেশজাল, মাথার উপরে চূড়ার মতো করে খোঁপা বাঁধা, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, কানে নূতন চন্দ্রলেখার মতো নির্মল কচি তাল-পাতার দুল ;—বঙ্গ বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করে ?

এই দুই প্রকার চিত্র পাশাপাশি দেখলে মনে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হ'ল এই দেবদাসীরা কোথা থেকে আসতো ? নগরে গৃহবধূদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা অতিশয় মর্যাদাব্যঞ্জক। 'ললাটে কজ্জলের টিপ, কর্ণে তিলপল্লব, সন্নতনয়না ধীর গামিনী এই নারী স্বতই তাঁর বংশোচিত মহিমা প্রতি পদক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন।'—উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবধূদের মুখে "সখি ধীরে পা ফেলে চল, নাগরাচার সব ছাড়। এখানে কটাক্ষে তাকালেও গ্রামপতি ডাকিনী বলে শূলে চড়ায়।' এই মন্তব্যে বোঝা যায় যে, গৃহবধূদের জীবন আর দেবদাসী বারনারীদের জীবন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকালের বুক থেকে হারিয়ে গেছে দেবদাসীদের পরিবারবর্গের ইতিহাস—তাই দেবদাসী প্রথার উদ্ভব ও ব্যাপকতার ইতিহাস আজ অনেকখানিই অনুমান-নির্ভর।

পূর্বদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যখন আর্য-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তখন এ সমস্ত অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের সামাজিক নিয়মাবলী বিঘ্নিত হয়ে একটা নতুন জীবনযাত্রা, বিশেষ করে নগরাঞ্চলে Superimposed (উপরিতলে স্থায়ী) হয়েছিল একথা অনুমান করা কঠিন নয়। তৎকালীন উপজাতি সম্প্রদায় কীভাবে কেউ কেউ সমাজে ঈষৎ স্বীকৃতি পেয়েছে, কেউ বা একেবারে অন্তেবাসী হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তার ভাসা ভাসা ইঙ্গিত চর্যাপদের পদগুলিতে পাওয়া যায় না এমন নয়। এখনো আদিম 'উপজাতি'দের মধ্যে শ্রমশক্তির আধার হিসাবে নারীর মূল্য যথেষ্ট। চর্যাপদেও আছে,—

গঙ্গা যমুনা মাঝে রে বহই নাই,
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই।
বাহ তু ডোম্বী, বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা,
সদগুরু—পা অ পসাএ যাইব পুনু জিনউরা।...ইত্যাদি

অর্থ—গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকা চলেছে ; তাতে চণ্ডালকন্যা ডুবে ডুবে হেলায় যোগীদের পার করছে। ডোমনী, তুই নৌকা বেয়ে যা লো বেয়ে যা, পথে বেলা হয়ে গেল। সদ্‌গুরুর পাদ-প্রসাদে জিনপুর যেতে হবে ইত্যাদি।

মদ চোয়ানো, সাঁকো গড়া, নৃত্যগীত, ইত্যাদি সব রকমের পেশাতেই স্ত্রীলোকদের স্থান ছিল। এই নিম্নশ্রেণী থেকে মেয়েদের যে তন্ত্রসাধনায় নেওয়া হতো, তারও প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ উচ্চবর্ণের লোকেরা নারীসঙ্গ লালসা মেটাবার জন্য দৃঢ়যৌবনা নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে

ধর্মীয় আচারের সাহায্যে শোধন করে নিয়ে যোগিনী, অবধূতী বা দেবদাসী বানাতেন, অদ্যাবধি এই প্রথাই চলে আসছে ভারতের বহু জায়গায়। নৃত্যগীতকে পেশা হিসাবে নিয়েছিল যারা, তাদের সমাজের নারীদের একটা অংশ আজও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে, পুরুলিয়া, বীরভূম ইত্যাদি স্থানে সমাজের স্বচ্ছল ধনীদের উপপত্নীত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়। ভাদু, টুসু প্রভৃতি লোকদেবতার পর্বসমারোহে অথবা বিবাহ উৎসবে তারা নাচগান করে। এদের 'নাচনী' বলা হয়। এই 'নাচনী'রা দেবদাসীর বিবর্তিত রূপের রূঢ় উদাহরণ, একথা বললে হয়তো খুব বেশী ভুল করা হবে না। তবে একথা ঠিক, অদ্যাবধি 'উপজাতি' সমাজে নারীর মূল্য ও সামাজিক অধিকার অনেক বেশী, কিন্তু পাল, সেন বা তার পরবর্তীযুগে আর্য জীবনযাত্রার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে নারীর মূল্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নি। সর্বাঙ্গীণ সমাজব্যবস্থায় তার ক্ষুদ্র স্থানটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, পুরুষ-মুখাপেক্ষী। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, আর্যযুগে নারীর মহিমময় স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি চালু কথা আছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, বিশ্ববারা ইত্যাদি কয়েকজনের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু এগুলি নিতান্তই আকস্মিক উদাহরণ। সম্পত্তি উপার্জন, তা উপভোগ এবং দাস বিক্রয়ের অধিকার সমভাবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ আমরা পাই না। মনুসংহিতার বা অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যা আছে, তা নিতান্ত অস্পষ্ট। 'স্ত্রীধন' বলে একটা সংজ্ঞা আছে, তার অর্থ, যৌতুকাদি উপলক্ষে প্রাপ্ত সম্পত্তি। এ ছাড়া অন্য কোনো সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নেই। এই রকম সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান যে কোথায় হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত সম্পদের মধ্যে অপ্সরারাও ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের আত্মসাৎ করেছেন। অপ্সরাগণও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণনীয় ছিল। এমন কি ব্রহ্মবাদিনী গার্গীও সামাজিক শাসন থেকে মুক্ত ছিলেন না, তাঁকে ধমক খেতে হয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। পুরো উদ্ধৃতিটি দিলে বোঝা যাবে বেচারী গার্গীর দোষ ছিল না। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের বর্ণনাটি এরকম,—

"অনন্তর গার্গী বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হে যাজ্ঞবাল্ক্য, এ সমুদয়ই জলে ওতপ্রোত রহিয়াছে, কিন্তু এই জল কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—হে গার্গি, বায়ুতে।

গার্গী—এই বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, অন্তরিক্ষ লোকসমূহে।

গার্গী—অন্তরিক্ষ লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত।

যাজ্ঞ—হে গার্গি, গন্ধর্ব লোকসমূহে।

গার্গী—গন্ধর্ব লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—যে গার্গি, আদিত্য লোকসমূহে।

গার্গী—আদিত্য লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, চন্দ্রলোকসমূহে।

গার্গী—চন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, নক্ষত্র লোকসমূহে।

গার্গী—নক্ষত্র লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, দেবলোকসমূহে।

গার্গী—দেবলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, ইন্দ্রলোকসমূহে।

গার্গী—ইন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, প্রজাপতি লোকসমূহে।

গার্গী—প্রজাপতি লোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ—হে গার্গি, ব্রহ্মলোকসমূহে ?

গার্গী—ব্রহ্মলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি ! অতিপ্রশ্ন করিও না, তোমার মস্তক যেন নিপতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করা উচিত নহে, তুমি তাঁহারই বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করিতেছ।" অনন্তর গার্গী বিরত হইলেন।

উদ্ধৃতিটি পড়লে মনে হয়, একটা সওয়াল-জবাবের আসরে যেন দু'জন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি তর্কযুদ্ধে ব্যস্ত। হঠাৎ তার মধ্যে একজন অপর জনকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'মাথাটা কাটা যেতে পারে, চুপ করো।'

আর একটা উদাহরণ কিন্তু বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে। মহাভারতের 'যযাতি-উপাখ্যানে' আমরা ঋষি গালবের বৃত্তান্ত পাই। রাজা যযাতি ঋষি গালবকে তাঁর প্রার্থিত অর্থ উপার্জনের উপায়স্বরূপ কন্যা মাধবীকে তাঁর হাতে দান করেছিলেন। মাধবী পর্যায়ক্রমে তিনজন রাজা, একজন ঋষির শয্যাভাগিনী হয়ে চারটি পুত্র প্রসব করে গালবের প্রার্থিত অর্থ উপার্জন করে ছিলেন। কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েও এ ঘটনার নৃশংস বর্বরতাকে চাপা

দেওয়া যায় না। কন্যা নিজে যে পিতার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হতো তার আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাজেই সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে যে, সে যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান ও মূল্য এমন কিছু ছিল, যার ফলে এই নারী-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ববর্তী স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থে স্ত্রীলোকের সম্পত্তিতে অধিকার পাবার উল্লেখ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। হয়তো কন্যার প্রাপ্য সম্পত্তি বিবাহসূত্রে যাতে পরহস্তগত না হয় তার জন্য কন্যাকে দেবদাসী করে রাখা হতো। অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো স্থানে ঠিক এই কারণেই দেবদাসী প্রথা চালু আছে। যাই হোক, কন্যা নিজেই যেখানে রত্নস্বরূপ, এবং তাকে দান বা বিক্রয় করা যেতে পারে, সেখানে তাকে দান বা বিক্রয় করার অধিকার পিতার আছে, একথা ধরে নেওয়া যায়। 'দান' কথাটা উত্তমর্থে চালু হয়ে গিয়েছে, 'বিক্রয়' কথাটাও আর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই 'দান' ও 'বিক্রয়'-এর ব্যাপারটা দেবদাসী প্রথার পশ্চাৎপট রচনা করেছে। রাজা বা পুরোহিতগণ যথেচ্ছ ক্রয় করেছেন এই বালিকাদের। আবার রাজার ভয়ে বা পুরোহিতের প্রসাদলোভে প্রজারা 'দান'ও করেছে মেয়েদের।

'পুরোহিত'-প্রথা ভারতীয় ধর্মীয় সমাজের একটা বিশিষ্ট দিক। রাজার চেয়েও পুরোহিতের মর্যাদা সমাজে অনেক বেশী। রাজসিংহাসন সর্বদা যে একই বংশের অধিকারে থেকেছে, তা নয়, কিন্তু পুরোহিতেরা বংশানুক্রমে একই পদে আসীন থাকতেন। পুরোহিত যেহেতু বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই একান্ত নিজস্ব পদ, সেজন্য বর্ণাশ্রম প্রথায় পুরোহিতের প্রাধান্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ ৺নির্মল কুমার বসুর মন্তব্যের উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে অসমীচীন হবে না,

> **"It is important to understand this aspect of Indian Social Life. Caste and the idealism of Brahmanical religion binds a man's life in a kind of total subordination. Changes brought about in modern times hit hard at that iron bondage. But it should be remembered that caste and sacred ritualism, let us call it 'priest craft' bound the hands and feet of men."**

ঠিক এই কথাটিই ভিন্নতর ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় পাই। তিনিও এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

"দেবাবিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না।...দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় সিংহের এবং প্রজা—অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান। পুরোহিত জড়চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।

অন্ধকার আলোর সঙ্গেই চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে। ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সংকীর্ণ, অতি অনুদার ভাব। উন্নতির সময়ে পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই তীব্র সমালোচনা তৎকালীন ভারতের ধর্মজীবনের দিকে একটা বিশেষ আলোকপাত করেছে। সমাজ-ব্যবস্থায় এই পুরোহিত সমাজের সহায়তায় যে সমস্ত ঘৃণ্য প্রথার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল দেবদাসী প্রথা। কলাবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি একদা তপস্যার স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে এবং শিল্পচর্চার অন্তর্গোষ্ঠীকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রথার সূচনা করেছিল, সেই ব্রাহ্মণ্য শক্তি কীভাবে পরবর্তীকালে আচার ও সংস্কার হিসাবে এ প্রথার বিস্তৃতিতে সাহায্য করল, তার ইতিহাসই বর্তমান দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে।

দেবদাসী প্রথার পশ্চাৎপট রচনায় এই ধর্মীয় পটভূমি উনিশ শতকের য়ুরোপীয় চিন্তানায়কদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। Karl Marx-এর 'The British Rule in India' নামক রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে,

> "...in a social point of view, Hindoostan is not Italy, but the Ireland of East. And this strange combination of Italy and Ireland, of a world of voluptousness and of a world of woes, is anticipated in the ancient traditions in the religion of Hindoostan. That religion is at once a religion of sensualist exuberance and a self-torturing asceticism : a religion of the Lingam and of the Juggernaut ; the religion of the Monk and of the Bayadere."

সমাজে 'দেববৎ পূজিত এই পুরোহিততন্ত্র সমগ্র সমাজ গঠনে নেতৃত্ব করয়েন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী নারীভোগের উপচার সংগ্রহ করা হতো।

অর্থশাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায় পুরোহিত, অধ্যাপক, যাজক, যজক সকলেই রাজার অবশ্য পোষণীয়। কাজেই সমগ্র ভূসম্পদ্ এবং মানবসম্পদের অধিকারী রাজার সর্বাতিশায়ী ইচ্ছা পুরোহিতরাও মেনে চলতেন। এই 'কম্প্রোমাইজ' বা সমঝোতা যুগে যুগে হয়ে এসেছে। এর পরিবর্তন সূচিত হলো অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা বেয়ে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু রাজ্যগুলি একে একে লুপ্ত হয়ে গেলেও এবং মুসলমান অধিকার স্থাপিত হলেও অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটে নি। য়ুরোপীয় বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে সমাজের গভীরতর কেন্দ্রস্থলে। সমাজের প্রাচীন কাঠামো তার যুগযুগান্ত ব্যাপী অস্তিত্ব থেকে ভেঙেচুরে গিয়ে একটা ভগ্নস্তূপের আকার নিয়েছে। নবসভ্যতার নবমন্দির তৈরী হতে শুরু করেছে আধুনিক শহরে। সে সভ্যতার ধারক ও বাহক এই আধুনিক শহরগুলি, সে সভ্যতা পরিপূর্ণভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতা।

য়ুরোপীয় বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলাতে শুরু করে। কালিকটে ভাস্কো-দা-গামার পদার্পণকে স্থানীয় মোপলা বণিকরা যে সুনজরে দেখেন নি, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই বণিকদের বিরোধিতা এবং কালিকটের শাসনকর্তা জামোরিনের অদূরদর্শিতা পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে এক ব্যাপক শত্রুতা ও সোজাসুজি যুদ্ধের সূচনা করে। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পর্তুগীজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, হুগলী ও চুঁচুড়ায় বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী সন্দ্বীপ অঞ্চলে পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু পর্তুগীজরা বাণিজ্য ব্যপদেশেই কেবল এদেশে আসে নি। দাসব্যবসায় চালাবার জন্য এরা ব্যাপক লুটতরাজ করতে থাকে, যে কোনো গ্রামের সমস্ত নারীপুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে ধরে নিয়ে গিয়ে দাসদাসী হিসাবে বিক্রয় করে দিতে থাকে। তমলুকের রাজাকে বাধ্য হয়ে তমলুকে দাসব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিতে হয়।

পর্তুগীজ 'হারমাদ'দের অত্যাচারে স্থানীয় নৌবাণিজ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাজশক্তির দুর্বলতা হেতু এদের দমন করাও অসম্ভব হয়। স্থানীয় জমিদারবর্গ কোনো কোনো সময় এই 'হারমাদ'দের নৌশক্তির সাহায্যও গ্রহণ করেন মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সময়। এই সমস্ত কারণে, অর্থাৎ দুর্বল রাজশক্তির শিথিল শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্যক্ষেত্রে নিদারুণ অনিশ্চয়তা এবং দস্যুদের অত্যাচারে গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থার ক্ষতি—এই সব কিছু মিলে উপজীবিকার

অভাব সমকালীন জনসমাজকে বিব্রত করে তুলতে থাকে। সমাজেও এই অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজের কাঠামো বদলে গেছে সুপরিকল্পিত ভাবে। শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়, যারা একদা সমাজে অতি উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য ছিলেন, তাঁরা গেলেন নিম্নস্তরে। বৃহৎ বাণিজ্যতরী নির্মাণকারী সূত্রধর সম্প্রদায় নেমে গেলেন নিম্নস্তরে। গন্ধবণিক সম্প্রদায় একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃত রইলেন পেশাগত ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃতি না থাকলেও। এরকম বহু সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস পরমধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলিতে বিবৃত।

এই সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাসের সংগে সংগে সংস্কৃতির পরিবর্তনও হয়েছে। বহির্বাণিজ্য যখন বিদেশীর করায়ত্ব, তখন অধিকাংশ দেশীয় পণ্যই বিদেশে রপ্তানি হতে শুরু করেছে। এই আমদানি-রপ্তানির বাজার হিসাবে নতুন নগর পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সনদ লাভ করে। ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে সার টমাস রো দিল্লীতে রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহানের ফরমান অনুসারে বাঙলায় প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ফররুখশীয়র ইংরেজ বণিকদের ৩৮টি নগরকে কর থেকে অব্যাহতি এবং একটি 'দস্তক' বা বাদশাহী অনুমতিপত্র দেন বিনা অনুসন্ধান ও তদারকিতে, যাতে তাঁরা বাণিজ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে ব্রিটিশ শক্তি বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

এই সমাজব্যবস্থায় স্বভাবতই এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের গভীরতর প্রভাব পড়েছে। ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থায় এদেশে কারিগরী বিদ্যার বিকাশ হতে শুরু করে। যার প্রথম সোপান ভারতীয় রেলওয়ে। রেলওয়ে নির্মাণের ফলে স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে নিকটবর্তী শহরে ও গ্রামে। শহরাঞ্চলে দিনমজুরী ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুরী। এক নতুন দাসপ্রথার সূচনা হয়েছে এই মজুর সংগ্রহের ব্যবস্থায়। চা-বাগানের কুলি যোগানের মাধ্যমে এই bonded labour বা দায়বদ্ধ শ্রমিক সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। এই শ্রমিকদের মেয়েরা নির্বিচারে উপভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পরিচালকবর্গের দ্বারা। ধীরে ধীরে এই উদ্বাস্তু নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের বারবনিতায় পরিণত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার এই উত্থান-পতন কীভাবে নর্তকী ও দেবদাসী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে, তার একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, উড়িষ্যার কোরাপুট

সম্বন্ধে ১৯৬৫ সালের গেজেটিয়ারে। জেপুর শহর ও অনুরূপ অন্যান্য শহরের বারবণিতাদের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক Thurston বলছেন—

"Guni is the name of Oriya dancing girls and prostitutes. It is derived from the Sanskrit Guna meaning qualification and skill in reference to their possession of qualification for and skill acquired by training when young. There were the other dancing girls whose apparent function was to dance in the temples but whose actual function was prostitution. After the abolition of estates, these classes are becoming extinct."

বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত মন্তব্যটি করা হয়েছে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনেরই পরিপ্রেক্ষিতে। ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি অবলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেবদাসী প্রথাও লুপ্ত হয়ে গিয়ে কেবল বারবণিতাবৃত্তি চালু রয়ে গেছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দুটি বিশেষ কারণে এই দেবদাসী প্রথা চালু ছিল। Performing artists বা পেশাদার শিল্পীদের একটা রাজকীয় রক্ষণ ব্যবস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে। রাজা উপযুক্ত ভূসম্পত্তি বা অর্থদান করে এই শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতেন। তা ছাড়াও মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে শিল্পীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। সাধারণ্যের রূঢ় স্থূল হস্তাবলেপ থেকে মুক্তি ও শিল্পীর গৌরব, এ দুই-ই যথেষ্ট কাম্য ছিল তাদের কাছে। দেবদাসীর সামাজিক মর্যাদা যে ক্রীতদাসীর চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদিও সময়ে সময়ে রাজভোগ বা পুরোহিত ভোগের উপকরণ হিসাবে দেবদাসীদের আত্মদান করতে হ'তো, তবু গণদাসীদের চেয়ে এ দাসীত্ব মর্যাদার বলেই মনে করা হতো।

রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হবার পরে প্রথম অর্থনৈতিক আঘাতটা পড়েছে এই পরজীবী শিল্পীগোষ্ঠীর উপরে। ধীরে ধীরে এই শিল্পীরা বারবণিতা শ্রেণীতে নেমে যাচ্ছে। উড়িষ্যায়, অন্ধ্রে, তামিলনাড়ুতে, কর্নাটকে, কেরলে, মহারাষ্ট্র গোয়াতে, সর্বত্রই এই ঘটনা ঘটেছে। এই পরিবর্তন একদিনে ঘটে নি। এখনও কোনো কোনো মন্দিরে এই প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু যে সামাজিক গঠন একদা একটা শিল্পকলাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার আমূল পরিবর্তন ঘটায় সমস্ত অবস্থাটা একটা বিকৃত আকার নিয়েছে। দেবদাসী প্রথার নামে গণিকাবৃত্তির প্রচলন এখন তাই বেশ স্বাভাবিক। মাদ্রাজ শহরের গণিকা পল্লীকে

'দেবীপল্লী' বলে অভিহিত করা হয়, তাদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারও কতকটা দেবদাসী সম্প্রদায়ের মতই।

দেবদাসী প্রথার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখনও চালু আছে অনেক জায়গায়। পতিতাবৃত্তিতে মেয়েদের নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই দেবদাসী প্রথার সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। কারা এই সুযোগ নিচ্ছে এবং কেনইবা নিচ্ছে, তা বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি সামাজিক প্রথা ও ধর্মপালনের পশ্চাৎপটে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা বিরাজ করে। এই শোষণ-ব্যবস্থা অর্থ-নৈতিক কাঠামোর বহিরঙ্গের উপর ততটা নির্ভর করে না। বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী শ্রেণী সর্বদা ধর্মের আশ্রয়ে লোকাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, যদি তা শ্রেণীস্বার্থের সহায়ক হয়। ভি. এস. খন্দেকর রচিত মারাঠী উপন্যাস 'দোন ধ্রুবে'র পটভূমি বেলগাঁও জেলা। পাত্রপাত্রীর কিয়দংশ ঐ জেলার অন্তর্গত কামাপুরের কমলেশ্বরী মন্দির এবং সেখানকার কাজু কারখানার শ্রমিকবৃন্দ। লেখক তাঁর উপন্যাসে তথ্যনির্ভর ভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সংবাদটি হ'লো এই যে, কারখানার মালিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারী করার দরকার হলে কমলেশ্বরীর পুরোহিতের উপর 'ভর' এর ব্যবস্থা করে। বসন্তরোগের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না করে ধর্মের ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে দেবীর প্রসন্নতা ভিক্ষা করা হয়। লোকসমাজে সংস্কারকে বজায় রাখার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় সংস্কারগুলিকেই বদ্ধমূল করে রাখা হয়। এই ধর্মীয় সংস্কারগুলিই অদ্যাবধি বহু কুপ্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এর জন্য যদিও দায়ী করা হয় সাধারণ লোকের অশিক্ষাকে কিন্তু এ অবস্থার পিছনে থাকে সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রয়াস, যাতে অশিক্ষার মূল উৎসাদন করা না যায়। শিল্পোন্নতি সর্বত্র জীবনযাত্রার সুষ্ঠু সমাধান করে না, উৎপাদন সম্বন্ধের বা Production relation-এর সুষ্ঠু বিন্যাসই সুস্থ জীবনযাত্রার মান তৈরী করতে পারে। শিল্প সম্বন্ধ বা Industrial relation যেখানে সুস্পষ্ট সংজ্ঞাভুক্ত নয়, সেখানে কেবল, কুসংস্কারকে দায়ী করে বেলগাঁও জেলার বা অন্য সব জায়গার ধর্মীয় কুপ্রথা বজায় থাকার কারণ বলে নির্দেশ করা যায় না।

বর্তমানে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে নারীপণ্যের ব্যবসায় চালু আছে ব্যাপক ভাবে। নবগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে এই ব্যবসায় চালু থাকার কারণ। এই প্রথা সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা এবং এ প্রথা উৎসাদনের প্রচেষ্টার পূর্বে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অশুভ দিকটি অনুসন্ধান করে

দেখতে হবে। পুরোহিতদের স্থান এই প্রথাকে চালু রাখার পিছনে কতখানি প্রভাবশালী তাও জানা দরকার। সমাজে পুরোহিতের মর্যাদার ব্যাপারটি আবহমান কাল থেকেই। স্বীকৃত রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতন সত্ত্বেও পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তির খুব একটা হের-ফের হয় নি। এই পুরোহিতগণ একদা রাজতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করে সমাজের শিক্ষা ও ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। শক্তির ভারসাম্য বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে খুব সহজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোহিতদের সমঝোতা হয়ে গেল। বস্তুত পুরোহিতদের প্রভাবে এবং কার্যকরী সাহায্যে অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মত দেবদাসী প্রথাও অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে, যদিও এ প্রথার সঙ্গে ধর্মের বা দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ধর্ম-বিপর্যয়ের যুগ

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে উত্তর ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ধর্মীয় পটভূমিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, তার ফলে দেবদাসী প্রথা এই অঞ্চলে লুপ্ত হয়ে গেছে বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। নৃত্যগীতের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় নি, দেব-পূজাও বন্ধ হয় নি, কিন্তু এই বিশেষ প্রথাটি কিভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগ্রত হয়। মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ, পালযুগ, সেনযুগ পর্যন্ত এই দেবদাসীদের নানা মূর্তি এবং এদের সম্বন্ধে সাহিত্যিক রূপায়ণ হয়ে এসেছে। হিন্দুযুগে বাংলা দেশে এবং উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন আর দেখা যায় না কেন, এ সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিংবদন্তীও নীরব। যতটা চোখে পড়ে, তার পটভূমি অজ্ঞাত, বাকিটা অনুমান-নির্ভর। এই প্রথা যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। বিশেষতঃ প্রতিবেশী অন্ধ্র ও কলিঙ্গে দেবদাসী প্রথা অদ্যাবধি বর্তমান। কাজে কাজেই, এই প্রথা বাংলাদেশে কীভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার একটা ইতিহাস থাকা সম্ভব, যদিও এই ইতিহাস অনুমানসাপেক্ষ।

দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই উত্তরভারত ক্রমাগত তুর্কী আক্রমণের শিকার হয়েছে। উত্তর ভারতে অবস্থিত মন্দিরগুলিতে সঞ্চিত ঐশ্বর্যের কাহিনী যথেষ্ট প্রচলিত হবার ফলে মন্দিরগুলিই তুর্কী অভিযানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং অবাধে লুণ্ঠিত হতে থাকে। গজনীর সুলতান মাহমুদের ১০০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারো বার ভারত আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল থানেশ্বরের মন্দির, নাগরকোটের মন্দির ও সোমনাথের মন্দিরের বিপুল

ধনসম্পদ। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত মন্দিরগুলিতেই দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল এবং ধনরত্নের সঙ্গে ঐ দেবদাসীরাও লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে গজনীর দাসীহাটে চলে যায়।

এর পর থেকেই ভারতবর্ষে ক্রমাগত মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম আক্রমণের আশঙ্কায় পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ত্রয়োদশ শতকের দাসরাজবংশ ১২৮৮ খ্রীস্টাব্দে জালালউদ্দিন খিলজীর সিংহাসনারোহণের ফলে লোপ পায়। ১৩২১ সালে তুঘলক বংশীয় গিয়াস্উদ্দীন তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের ফলে খলজী বংশের পতন হয়। তুঘলক্ বংশের পতন ঘটে ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ বংশ ক্ষমতা লাভ করার ফলে। ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দে বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। লোদী বংশের শেষ সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে পাণিপথের প্রথম শক্তি পরীক্ষায় মুঘল শক্তির প্রতিষ্ঠাতা বাবর জয়লাভ করে ভারতে এক নতুন শাসনব্যবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিভিন্ন বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাসের মাঝে আরো দুটি ভয়াবহ ধ্বংসলীলার ইতিহাসও আছে। ১২১৮ খ্রীস্টাব্দে চেঙ্গিজখানের অভিযান এবং ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ, সমগ্র দেশের একটা বিরাট অংশকে হত্যা ও লুণ্ঠনের দ্বারা শ্মশানে পরিণত করে।

এই সময় ভারতে যে ক'টি হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, সেগুলো হল, চিতোর, মারোয়াড়, বিকানীর, জয়পুর ও জয়শলমীর, বিজাপুর, আহম্মদ নগরের ক্ষুদ্র রাজ্য, মালব, দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি।

এই ঐতিহাসিক উত্থান-পতন, শক্তি পরীক্ষা, লুণ্ঠনের অবাধ ব্যবস্থা, সব কিছুই ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সমাজ-ব্যবস্থায় এর সুদূরপ্রসারী ফল কি হয়েছিল, তার কিছুটা আভাস আমরা পাই পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজসভাকবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকায়'। এই দুটি গ্রন্থে বিদ্যাপতি তুর্কী আক্রমণের পর সমাজের অবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন।

"হিন্দু তুরকে মিলল বাস,
একক ধম্মে অওকো উপহাস
কতহুঁ বাঙ্গ, কতহুঁ বেদ,
কতহুঁ মিলিমিস, কতহুঁ ছেদ।

কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা,
কতহুঁ নকত, কতহুঁ রোজা।
কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কুজা,
কতহুঁ নীমাজ, কতহুঁ পূজা।
কতহুঁ তুরুক বরকর।
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন বডুআ,
মথা চড়াবএ গাইক চুড়ুআ।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়ি ধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গো মঠ পূরলি মহী,
পএরহু দেবাক ঠাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার,
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।

[হিন্দু ও তুরকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্মে অপরের উপহাস। একের বাঙ্গ (আজান) অপরের বেদ। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা, অপরের খোজা। একের নকত অপরের রোজা। একের তাম্রকুণ্ড, অপরের কুঁজা। একের নমাজ, অপরের পূজা। কত তুরুক রাস্তায় যেতে যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চড়াতে চায়। ধোয়া উড়ি ধানে মদ চোলাই করে দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহীপূর্ণ হল, পা দেবার একটুও স্থান নাই। হিন্দুকে বলে দূরে নিকালো। তুরুক ছোটো হলেও বড়কে মারতে যায়।]

হাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

তুরুক তোখারহিঁ চলল হাট ভমি ফেড়া মাঙ্গই,

অড়ী দীঠি নিহারি দবলি দাঢ়ী থুক বাহই। অর্থাৎ তুরুক সওয়ার হাটে ঘুরে বেড়ায় ফেরা (তোলা) মেগে; তারা আড়দৃষ্টিতে চায়, দাড়ি আঁচড়ায় আর থুথু ফেলে।

সঅদ সেরণী বিলই সবকো জুঠ সবে খাই,
দোআ দে দরবেশ পাব নহি গারি পারি নাই।

অর্থাৎ সৈয়দেরা শিরনি বিলায়, সকলের উচ্ছিষ্ট (ঝুঠা) সকলে খায়, দোয়া (আশীর্বাদ) দিয়ে কিছু না পেলে দরবেশ গাল পেড়ে চলে যায়।

বিনু কারণহি কোহাএ বদন তাতল তমুকুণ্ডা, অর্থাৎ বিনা কারণেই তারা কুপিত হয় আর তাদের বদন হয় তপ্ত তামার টাটের মতো লাল।

বিদ্যাপতির বর্ণনাটি তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের এক উল্লেখযোগ্য চিত্র। একদিকে যেমন অত্যাচার চলেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজসভাসদ হিন্দু উচ্চবর্ণ ও উচ্চবংশীয়রা রাজপ্রশস্তি রচনা করছেন,

"শ্রীমদ্ গৌড়মহী মহীপতি পতি প্রাপ্ত প্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাৎ প্রাক্তন কর্মণোঽতি পদবী শ্রীসত্য খানাঙ্কিতা।
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজ খান পদবী লব্ধা ধরা মণ্ডলে
জীয়াদ্ধর্ম ধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ ॥

অর্থ—'শ্রীমান্ গৌড়রাজচক্রবর্তীর কাছ থেকে অনুগ্রহসম্পদ লাভ করে পূর্বজন্মের পুণ্যফলে যিনি প্রথমে "সত্য খান" এই উচ্চ উপাধি ও পরে 'শুভরাজ খান' পদবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্মধুরন্ধর ধীরগুণ গভীর কুলধরের জয় হোক।'

নাগরিক সাধারণের সমাজে ও গ্রামীণ সমাজে এই ধর্মীয় জটিলতা যতই সংকট সৃষ্টি করুক, রাজসভাকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ চাটুবাক্যের সহায়তায় রাজপ্রসাদ যাচ্ঞা করে আসছেন, সেখানে কোনো সংকট আভাসিত হচ্ছে না। তখনকার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে সমাজ ও ধর্মজীবনে যে কতখানি ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় নানা উদাহরণে সংকলিত আছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আগবতে আছে,

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও,

"কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

... .

গীতা ভাগবত যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

... ...

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

... ...

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥

বৌদ্ধ যুগের অন্তিম অবস্থায় সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক রীতি-নীতি পূর্ববর্তী যুগের বৌদ্ধ সংঘারামের রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব সংঘারামে রমণীদের আশ্রয় দানের বিরোধী ছিলেন প্রথম থেকেই, পরে মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা রচনা করে গৌতমীর অধীনে পৃথক সংঘারামে ভিক্ষুণীদের আশ্রয় দান করেন। পরবর্তীকালে যতই বৌদ্ধশাস্ত্র তান্ত্রিক জটিলতায় ভিন্ন পথে অগ্রসর হল, ততই ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পূর্বপ্রথা হ্রাস প্রাপ্ত হলো। তান্ত্রিক চক্রসাধনায় নির্বিচারে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন তাঁরা। এই সহজিয়া সাধনার গভীর তাৎপর্য বিচিত্র 'সন্ধ্যা' বা দুর্বোধ্য জটিল ভাষায় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই চর্যাপদগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে ডোম্বী ও শবরীর কথা। দুইজন

গুলিতেও উল্লেখ আছে ডোম্বীপাদ ও শবরীপাদ নামে। এই ডোম্বী ও শবরী উভয়েই 'মহাসুখে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—

'এক সে পদুম চৌষট্‌ঠি পাখুড়ী,
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

অথবা,

নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাই সি বাহ্মণ নাড়িআ।'

কিন্তু জটিল ভাষার আড়ালে যতই ধর্মের তত্ত্ব গুহানিহিত থাকুক না কেন, সমকালীন জীবনযাত্রা ও সমকালীন সমাজেরও অনেক সংবাদ এই পদগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। নৃত্যগীতপ্রিয় নিম্নশ্রেণীর ডোম ও শবর জাতির সম্বন্ধে সমকালীন উচ্চবর্ণের আগ্রহ যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও তান্ত্রিক চক্রসাধনায় নারী অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। পঞ্চ ম-কার-এর অন্যতম নারী। এই চক্রসাধনার উপযুক্ত রমণী কোন্ কোন্ জাতি থেকে আসবে সে সম্বন্ধে বলা হয় যে, ব্রাহ্মণী, তন্তুবায় পত্নী, রজকী, চণ্ডালিনী ও নটী। নারী সংগ্রহের চালাও ব্যবস্থা যে ছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতের' সাক্ষ্য স্মরণীয়।

কামতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রচলন আরো বেশী করে ঘটেছিল তার কারণ সম্ভবতঃ পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার অভাব। বহির্বাণিজ্য ব্যবস্থাও তা বাধা ঘটিয়েছিল। ফলে ধনশালী এক সম্প্রদায়ের অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই কদাচার সমাজে বীভৎস বিস্ফোটকের মত হয়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র বাংলা দেশেই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও লোকধর্মের নীতিহীনতার ফলে সনাতন হিন্দু ধর্ম নবাগত ইসলাম ধর্মের মুখোমুখি হয়ে বেশ নড়বড়ে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। এই অবস্থার পটভূমিকায় ভক্তিবাদের সূচনা। বাংলা দেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ হিসাবে এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্মর্তব্য। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম বাঙালী জাতির মনে এক নতুন প্রেরণা ও শক্তির সঞ্চার করতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণপ্রধান ও ব্রহ্মণ্যশাসিত সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক নতুন ভাবদীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন তিনি। সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁর প্রচারিত এই প্রেমধর্ম এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। রূপতন্ত্র ও কামতন্ত্রের স্থূলতা প্রেমের বৈদ্যুতী স্পর্শে তৎসমকালীন শিল্পীচিত্তে এক নতুন উপলব্ধি জাগিয়েছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কারণও তাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের ও তাঁর সহচারীদের সাক্ষাৎ প্রভাবের

অন্তরালে আবার ধীরে ধীরে এই নারীলোলুপতা যে শিকড় মেলছিল তার প্রকাশ ঘটতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে। বিভিন্ন বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে আবার ধর্মের আবরণে নারী উপচার সংগ্রহের অপচেষ্টা ব্যাপক ভাবে শুরু হতে থাকে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—

"তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন ও একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত এক বা একাধিক ছোট-খাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সাধারণতঃ তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও তান্ত্রিক শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে।...তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুরু ও শিষ্য ও আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী, তাঁতির কন্যা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণী একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী)-সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। আজি হইতে লজ্জা, ঘৃণা, শুচি অশুচি জ্ঞান, জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মদ্য, মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ করিবে। এবং মদ্য, মাংস, প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদানস্বরূপ মনে করিবে। তান্ত্রিকেরা অনেক বীভৎস আচরণ করে যেমন মানুষের মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের একত্র সুরাপান ইত্যাদি।"

বৈষ্ণব সহজিয়াদেরও অনেক শাখা আছে। আউল, বাউল, সাই ইত্যাদি ছাড়াও কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখী ভাবক, কিশোরী ভজনী, রামবল্লভি, জগন্মোহিনী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় সহজিয়া মতাবলম্বী। এই বিভিন্ন শাখার সহজিয়াদের মধ্যে সাধন প্রণালীর যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও গুরুবাদ, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে।

এই সহজিয়া সম্পদায়ের মধ্যে ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি।

স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়েও স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতার অবাধ প্রচার একেবারেই ছিল না। এই দলের সন্ন্যাসিনীরা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্তুতিমূলক গান গেয়ে নৃত্য করতো।

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা স্ত্রীলোকের নাম ধারণ করে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে নৃত্যগীত করতো।

দুর্গাপূজার শবরোৎসব নামে যে উৎসব প্রচলিত ছিল, তার প্রধান অঙ্গ ছিল অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্যগীত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও কালবিবেক গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এই পূজা উপলক্ষে যে নৃত্যগীত হ'তো তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের উল্লেখ,

> "দিনের পূজা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়িতে একদল বেশ্যার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে তাহাকে দেহের আবরণ বলা যায় না। গানগুলি অত্যন্ত অশ্লীল ও নৃত্যভঙ্গী অতিশয় কুৎসিত।"

সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকেই আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়াগুলিতে 'কিশোরী ভজনের নামে বালিকা সংগ্রহ এবং তাদের নিয়ে এক নতুন দেবদাসীবৃত্তির সূচনা। নবদ্বীপ, কেন্দুলী ও অন্যান্য বৈষ্ণবপ্রধান অঞ্চলের মেলায় 'সেবাদাসী' সংগ্রহের নানা কৌতুককর প্রথা দেখা যায়। সাধারণ বৈষ্ণবগণ কণ্ঠী বদলের মাধ্যমে সঙ্গিনী সংগ্রহ করেন, আবার 'সেবাদাসী' সংগ্রহ করাও হয় কৌতুককর একটি প্রথার মাধ্যমে। আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় হাতের একটি আঙ্গুল বের করে মেয়েরা সারি সারি বসে থাকে এবং সংগ্রাহকেরা তাদের হাত ধরে নিয়ে যায়। ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেবার ফলে কারুর জোটে সুন্দরী দাসী, কারুর বা অসুন্দরী। এই 'সেবাদাসী'র দল অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী। তবে অন্যান্য ভাবেও যে 'সেবাদাসী'দের সংগ্রহ করা হতো তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অর্থের বিনিময়ে, কখনো বা বলপ্রয়োগে নিম্নশ্রেণীর বালিকাদের নিয়ে 'ভেক দিয়ে' তাদের বিভিন্ন আখড়ায় নিয়োজিত করা হয়। এই 'সেবাদাসী'র দল দেবদাসী প্রথারই বিবর্তিত রূপ বললে খুব ভুল করা হয় না। বারাঙ্গনাদের তুলনায় এদের সামাজিক মর্যাদা অধিকতর ছিল। উপরন্তু এই সেবাদাসীরা কেবল আখড়ার প্রধান বৈষ্ণবেরই সেবাদাসী, সাধারণ লোকের ভোগ্যা নয়। এঁদের সামাজিক মর্যাদাও তাই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমারী পূজা ও চক্রসাধনার জন্য নারী সংগ্রহের ব্যবস্থা যে ব্যাপকভাবেই ছিল তার উল্লেখ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকেই পাওয়া যায়। এই নারীরা স্থানীয় মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতো অনেকেই। 'ভৈরবী' বৃত্তি ধারিণী এক শ্রেণীর নারীর পরিচয় আমরা পাই নানা স্থানে। ছোটোখাটো মন্দিরে অনেকেই সেবায়েৎ হিসাবে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে 'দেয়াসিনী' নামে এক শ্রেণীর মেয়েদের পরিচয় পাওয়া যায়। অলৌকিক 'ভর' ইত্যাদির সাহায্যে জনমানসে ভক্তি ও ভয়ের সঞ্চার করা ছিল এদের কাজ। এদের অনেকেই বালিকাবয়সে দীক্ষিত হতেন। দেবদাসীদের মতো এদেরও জীবনযাত্রা সাধারণ্যে স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয়, সামাজিক কলঙ্কের ঊর্ধ্বেই এদের বিচরণ। অদ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের নারীগণ ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষে সংযুক্ত। তবে দেবদাসী প্রথার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত নৃত্যগীত বাদ্যের শিক্ষা ও তার পরিবেশনা এ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নেই। নৃত্য-গীত বাদ্য ক্রমশঃ ধর্মসম্প্রদায় থেকে সরে গিয়ে সোজাসুজি আশ্রয় নিয়েছে বারবণিতা মহলে।

মধ্যযুগে নবাব ও সুলতানদের অন্তঃপুরে নর্তকী থাকা ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সুলতান বা নবাবের নিজস্ব দাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য-গীতকুশলা নারীগণের প্রচুর সমারোহ ছিল। এছাড়াও বেগমদের নিজস্ব সখীসম্প্রদায় ছিল, যারা নৃত্যগীতের সাহায্যে প্রভুদের মনোরঞ্জন করতো। সুলতান, বাদশাহ বা নবাবের দেখাদেখি বড়ো বড়ো হিন্দু রাজপরিবারেও এই নর্তকীদের দলকে রাখা হতো। অবশ্য রাজ অবরোধে নৃত্যগীতকুশলা নর্তকীর অধিষ্ঠান আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। রাজস্থানের রাজাদের অন্দরমহলের বর্ণনা প্রসঙ্গে মাত্র চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগেও দেখতে পাই, যে, গ্রামাঞ্চল থেকে কিনে আনা, স্বেচ্ছায় রাজার কাছে দান করা অথবা রাজা মৃগয়ায় গেলে কিংবা রাজার নজরে অন্যভাবে পড়লে, তাকে কেড়ে নিয়ে আসা, এইভাবে সংগৃহীত সুন্দরী দাসীতে রাজঅন্তঃপুর ভরা থাকতো। বালিকা দাসীদের যত্ন করে নাচগান শেখানো হতো। তাদের বলা হতো পাত্রী। এরা বড়ো হয়ে 'সখী' পদবীতে উন্নীত হতো। পরে রাজার বাৎসরিক 'সালগিরা' বা জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজার ইচ্ছা অনুসারে কেউ হতো 'পর্দায়েৎ', কেউ বা 'পাশোয়ান'। এই নারীদের অনেকে অসীম ক্ষমতারও অধিকারিণী হতেন। তবে এই প্রথা যে দেবদাসী প্রথা থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে, তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ সামাজিক কলঙ্ক বা Social Stigma এদের প্রতি কিছুটা প্রযোজ্য হতো। সাধারণ লোকের কাছে এরা রাজ পরিবারের

লোক বলে সম্মানিত হলেও জাতি বিচার অনুসারে এদের মর্যাদা তুলনামূলক ভাবে দেবদাসীদের থেকে অনেক নিম্নবর্তী ছিল। অবশ্য এইরকম সামাজিক স্তরভেদের ব্যবস্থা নতুন নয়, বৌদ্ধযুগেও অনুরূপ জাতিভেদের কথা শোনা যায়। কোশলমহিষী 'বাসব ক্ষত্রিয়া' দাসীকন্যা ছিলেন। তাঁকে রাজকন্যা হিসারে মিথ্যা পরিচয়ে কোশলরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এর পরিণামে রাজপুত্র মাতৃকুল ধ্বংসে ব্রতী হন এবং লিচ্ছবি গণরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আরো অনেক উদাহরণ আছে এই ধরনের। দেবদাসী প্রথার পাশাপাশি 'নগরমুখ্যা' নটী-প্রধানার অস্তিত্বও ছিল বহুল পরিমাণে। প্রাচীন Performing art বা নৃত্যগীত প্রদর্শনের যে অন্তর্গোষ্ঠীটি আগে কেবল গুহামণ্ডকেন্দ্রিক ছিল, তাই বিবর্তিত হয়ে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়, একটি মন্দিরকেন্দ্রিক এবং অপরটি রাজসভাকেন্দ্রিক। পরে রাজসভাকেন্দ্রিক নৃত্যগীতের নায়িকারা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বে বিলীন হয়ে রাজঅন্তঃপুরের উপপত্নী ও সখীর দলে পর্যবসিত হয়।

এ ছাড়াও মধ্যযুগের ইতিহাসের স্তরভেদে যে কথাটি সবচেয়ে বেশী করে মনে রাখার মতো, তা হল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব, এবং এই ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মুখোমুখি দুটি শক্তিশালী ধর্মের সংঘাত। একটি ইসলাম ধর্ম, যার প্রভাবে উত্তরাপথের ব্যাপক ভূখণ্ডে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটেছিল, জন্মগ্রহণ করেছিল এক মিশ্র সংস্কৃতি। অন্যটি খ্রীস্ট ধর্ম, যার প্রভাব পরবর্তীকালে জনজীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং যার প্রভাবে নগর ও গ্রাম সংস্কৃতির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রচিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পর্তুগীজ বণিকশক্তি ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশ ঘটে কীভাবে ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জী অনুযায়ী তার একটা চিত্র উপস্থিত করা যাক—

মে, ১৪৯৮—কালিকট বন্দরে পর্তুগীজ বাণিজ্যপোতের আগমন। এর পরেই গোয়া, বোম্বাই ও সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন। পরে ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ। ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে।

১৫৯৫—ডাচ্ বণিকেরা চন্দননগরে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়।

১৬০০—লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়।

ডিসেম্বর ১৬০০—রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে পূর্বাঞ্চলে রেশম, সূতা ও

রত্নের বাণিজ্য করার সনদ নিয়ে কোম্পানী একজন গভর্ণর ও ২৪ জন কমিটি-সভ্য নিযুক্ত করে।

১৬০১—প্রথম বাণিজ্যতরী রওনা হয়।

১৬১৩—বাদশাহী ফরমান সহ কোম্পানী সুরাটে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়।

বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশ ছিল রাজনীতির খোলা ময়দান। সেই কারণে ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়ের সময় একটা নতুন লোকায়ত ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা হয়েছিল, যদিও স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে নির্বিঘ্নে তাঁর সাধনা করতে পারেন নি। রাজশক্তি তাঁর পরিচর বর্গকে নানাভাবে উত্যক্ত করেছে। মহাপ্রভু নিজেও কলিঙ্গ রাজের আশ্রয়ে নীলাচলে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতক থেকেই বাংলার বহির্বাণিজ্য ক্রমশ: 'হারমাদ' ফিরিঙ্গীদের জন্য সংকুচিত হতে থাকে। তার আগেই, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে পর্তুগীজ বণিকেরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকে। চট্টগ্রাম, হুগলী, পাটনা ও পিপলী বন্দরে এই বণিকদের সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত হয়। পর্তুগীজ বণিকেরা প্রধানতঃ আরব মূর বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আসে এবং তাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পাওয়ায় সরাসরি শত্রুতা শুরু করে। এই শত্রুতায় সমগ্র বণিক শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে, কারণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সমুদ্রগামী বাণিজ্যতরী লুটপাট করাই পর্তুগীজদের একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে। পর্তুগালের সম্রাট তাঁর বণিকদের উপর তাঁর দেশের কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি, বরং রাজদণ্ডে দণ্ডিত-দেরও সুদূর বিদেশে অর্থাৎ ভারতে প্রেরণ করেছিলেন। এরা সমগ্র বঙ্গদেশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে লুটপাট চালাতে থাকে এবং বহুসংখ্যক বালক-বালিকা ও নরনারী অপহরণ করে তাদের দাসরূপে বিক্রী করতে থাকে। এদের হাতে যে কত নিরীহ লোক মারা গেছে, কত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তার সীমা নেই। তালিশ রচিত ফতিয়া-ই-ইব্রিয়ার সাক্ষ্য অনুসারে তমলুকের রাজা বাধ্য হয়েছিলেন তমলুক নগরকে দাসব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে। তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে, অন্যথায় দেশ ছারখার করে দেওয়া হবে। Pyard de Laval গোয়ার ক্রীতদাসী বাজারে যে সুন্দরী মেয়েদের দেখেছিলেন তারা ছিল বঙ্গদেশ থেকে আহৃত। সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলা শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল এই হারমাদদের অত্যাচারে।

মুঘল সম্রাট নিজেও এই পর্তুগীজ হারমাদদের যথোচিত ভাবে দমন করতে

পারেন নি। এই বহিরাগত উপদ্রবে সমগ্র বঙ্গদেশেই একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, অর্থনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পর্তুগীজ ক্যাথলিক ধর্মের স্থানীয় মেয়েদের বিবাহাদি করে ধর্মান্তরিত করেছিল। নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকজন বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরী হয়েছিল এবং তাদের পর্তুগীজ নামও নির্ধারিত হয়েছিল। অদ্যাবধি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অঞ্চলে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত বহু লোকের বাস। বরিশালের অনেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের 'নমকার্ত্তিক' নামে পরিচয় দেয়। তারা অতীতে নমঃশূদ্র শ্রেণীর অন্ত্যজ বলে পরিগণিত ছিল, পরে ক্যাথলিক হয়। কিন্তু পূর্বতন নমঃশূদ্রের 'নম'টুকু অদ্যাবধি তারা ব্যবহার করে চলে নিজেদের জাতি পরিচয়ে। এই ধর্মান্তরিত দেশীয়দের মধ্যে বহু নারীকে ও বালিকাকে ধর্ম-সংগঠনভুক্ত (church) করা হয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেক সময়-বিক্রয় উদ্যত দাসপ্রভুর কাছ থেকে সহৃদয় ধর্মযাজকেরা বালক-বালিকাদের কিনে নিতেন। 'দোম্ আন্তনিও' নামে অনুরূপ একজন যাজকের রচিত ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ অদ্যাবধি প্রচলিত। ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র, পর্তুগীজদের দ্বারা অপহৃত হন। পরে সম্ভবতঃ মিশনারীরা এঁকে উদ্ধার করে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

এই দাসীকৃত এবং পরে ধর্মান্তরিত সন্ন্যাসিনীদের আমরা অবশ্য দেবদাসী বলতে পারি না। যাই হোক, দাসপ্রথার ইতিহাসে নারীকে যে প্রধান অবমাননা যোগ্য বস্তু হিসাবে চিরকাল মনে করা হয়েছে এটা তারই প্রমাণ। রমণীর রূপলাবণ্য যে চিরকালই তার শত্রু একথা বহু দুঃখেই বাংলার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে সেই দশম শতাব্দী থেকেই—

> 'অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী'।
>
> 'হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য নিজেরই শত্রু।

দেবদাসী প্রথার বর্তমান প্রেক্ষাপট

বর্তমানে দেবদাসী প্রথা ব্যাপক ভাবে বেড়ে চলেছে বিশেষ একটি ভূখণ্ডে। কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়া, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে এই প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলের শহরগুলিতে বারবণিতার চাহিদা। সম্প্রতি মধ্য-প্রাচ্য এলাকায়ও যে-সমস্ত মেয়ে-চালানী কারবার চলছে, তার সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ সবচেয়ে বেশী, অবশ্য ভারতের পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু পরিবারও তার বাইরে নয়। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রথার ব্যাপ্তি প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে।

মহারাষ্ট্রের সাংলী জেলার গেজেটিয়ারটি কৌতূহলোদ্দীপক। এই গেজেটিয়ারে দেবদাসী প্রথার উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বিচিত্র জাতিবিন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে কতকগুলি তপশীলভুক্ত নিম্নজাতির মধ্যে 'মাঙ্গ' জাতি, 'মাহার' জাতি ও 'চামার' জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এরা নাচগানে পারদর্শী। বর্তমানে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এই সাংলী জেলাতেই মাঙ্গ জাতির উপাস্য দেবী 'ইয়ালাম্মা'কে কেন্দ্র করে দেবদাসী প্রথা চালু আছে।

মহীশূরের গেজেটিয়ারে উল্লিখিত আছে,

"Social evils, like prostitution, traffic in women and gambling have been prohibited by law ; but they do exist to a certain extent especially in towns. The 'Basavi' system, which inyolved a sort of prostitution was prevalent in the district. In a few castes, in a few cases, the daughter instead of being given in marriage was dedicated to a god or goddess and was turned into what is known as 'Basavis'. Sometimes a girl suffering from

serious illnes was promised to be so dedicated, if she recovered. In a few families, it was a custom to dedicate one of their daughters, often the eldest. Sometimes a girl became a 'Basavi' if she was unable to get a bride-groom. This social evil is surviving in a few places in a clandestine way."

কর্ণাটকে 'দেবদাসী' কথাটা চালু নয়। ব্যবহারিক সংজ্ঞা হ'ল 'বাসবি', 'কস্‌বি', 'সুলী' ইত্যাদি। 'বাসবি' কথাটি ব্যবহৃত হয় স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েদের উদ্দেশ্যে। 'কস্‌বি' অর্থে যে রমণী কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত (রূঢ়ার্থে দেহ ব্যবসায়), 'সুলী' সাক্ষাৎ ভাবেই বারবণিতা।

কর্ণাটক মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশেই এই প্রথা এখন ব্যাপক ভাবে বর্তমান। কিন্তু এই প্রথা অতীতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যেই প্রচলিত ছিল। পতিতাদের পল্লীগুলির বিভিন্ন নাম, গোয়াতে এদের নাম 'ভবানী', পশ্চিম উপকূলে 'কুড়িকার', অন্ধ্রে 'ভোগম্ বন্ধলু', তামিলনাড়ুতে 'তেভডিয়ার' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' ও 'আরাধিনী'।

'বাসবি' ও 'দেবদাসী' সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। দেবদাসীরা প্রধানত: দেবমন্দিরের দাসী, কিন্তু 'বাসবি'দের মধ্যে নানা স্তর বর্তমান। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রথমে এই 'বাসবিরা কেবল ধর্মকার্যেই নিযুক্ত থাকতো, কিন্তু কালক্রমে এরা বারবণিতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে 'বাসবি' কথাটার অর্থই দাঁড়িয়ে গেল স্বৈরিণী নারী।

কর্ণাটকের বাসবিদের মধ্যে একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, 'বাসবি'দের মধ্যে পাঁচটি স্তর আছে।

১. গুড়ী বাসবি। এরা মন্দিরে উৎসর্গীকৃত। (গুড়ি অর্থে মন্দির)। এই বাসবিরা মন্দিরে বিভিন্ন ভাবে কর্মরত থাকত : (ক) দীপদা বাসবি, যে প্রদীপ ইত্যাদির দেখাশুনা করে, (খ) কম্বদা বাসবি, যে পবিত্র স্তম্ভের দায়িত্ব নেয়, (গ) ঘণ্টে বাসবি, যে ঘণ্টা বাজায় ইত্যাদি।

বিভক্ত বাসবি সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কারণ হিসাবে যা জানা গেছে, তা নিম্নলিখিতরূপ :

ক. এই মেয়েরা নৃত্যগীতবাদ্যে পারদর্শিনী ও সুন্দরী। কারণ সুন্দরী মেয়েদেরই উৎসর্গ করা হয়। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়, পুরোহিত ও রাজার মনোরঞ্জন।

খ. স্থানীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা স্থায়ী ছিল না। মেয়েদের নিজস্ব

উপার্জনের ক্ষেত্রও ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল। জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তারা বারবণিতা বৃত্তির সহজ আশ্রয় নিয়েছে।

গ. দাক্ষিণাত্যের ছোটো ছোটো রাজাদের আন্তঃকলহ এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। রাজা বদল হয়েছে অনেকবার, ধর্মেরও বদল ঘটেছে। ফলে মন্দিরের সাক্ষাৎ রক্ষণাবেক্ষণে থাকার সুবিধা মন্দিরদাসীদের ভাগ্যে ঘটে নি। রাজকোষেব রত্নবাজি, মন্দিরের বিগ্রহের রত্নরাজি এবং রাজঅন্তঃপুর ও মন্দির-অন্তঃপুরেব স্ত্রী-রত্নরাজি বার বার লুণ্ঠিত হয়েছে। ফলে কেবল নিত্য নতুন রাজাদেরই নয়. এই মন্দির-দাসীরা নিত্য নতুন ক্ষমতাশালী পুরুষদেরও ভোগের সামগ্রী হয়ে গেছে।

এই অবস্থাটা কিছু বৃত্তিসন্ধানী সুযোগকামীদের কাছে একটা নতুন মস্তকা হিসাবে এসেছে। সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্মবোধের সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জনের একটা সহজ উপায় হিসেবে এই বৃত্তি স্বীকৃত হয়ে গেলো। এই বৃত্তির স্তরভেদ আছে নানা রকম। তা হ'ল—

১. বালাগাডা বাসবি—কোনো পরিবারের একটি বিশেষ শাখা বা তার আত্মীয়দের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকত। সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর রক্ষিতা হিসাবেই এরা থাকত। মন্দিরের পুরোহিত, কোনো বিশেষ নৃত্যশিক্ষক, বা কেবলমাত্র গ্রামেব প্রধান মোড়ল, এরাই এই শ্রেণীর বাসবি'দের পরিচর্যা পেত। এই শ্রেণীর বাসবিরা সামাজিক মর্যাদাবও আধিকারী ছিল। এদের সন্তানাদির উপরও কোনো কলঙ্কচিহ্ন বা Social Stigma আরোপিত হতো না। 'বাসবি' শ্রেণীর মেয়েদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষিত হত, কারণ দেবতার নির্মাল্য হিসাবে তাদের কোন জাতি থাকত না।

২. মনে বাসবি—একটি পরিবারের যুবকদের উপপত্নী হিসাবে এরা থাকে। ব্যবস্থাটি সম্ভবতঃ এজন্যই, যাতে যুবকরা স্থানীয় পতিতা পল্লীতে না গিয়ে ঘরেই বৈচিত্র্যের স্বাদ পায়। উত্তর ভারতেও এরকম পারিবারিক দাসী থাকে, যারা গৃহকর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনিবের শয্যাভাগিনীও হতে বাধ্য। মুসলমান পরিবারে বাঁদীদের অথস্থাও একই রকম। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবারে জীবনযাত্রা বিচিত্র। এই গৃহরক্ষিতা উপবণিতারা ধর্মাশ্রিত বলে। গৃহিণীর পক্ষে সান্ত্বনা সূচক এবং বহুভোগী পুরুষদের পক্ষেও বিনা খরচে কেবল সামান্য খাওয়া-পরার বিনিময়ে নারীসঙ্গ লাভের সুবিধা। পারিবারিক দায়িত্ব তাদের প্রতি নেই এই মেয়েরা আর্থিক স্থিতির দিক থেকে সবচেয়ে অবহেলিত, তাড়িয়ে দিলেও তাদের যাবার জায়গা কোথায় ?

৩. জাতি বাসবি—কোনো বিশেষ একটি জাতিরই সেবা করবে। অন্য জাতির নয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই এ সুযোগের অধিকারী। অথবা অন্য নিম্নজাতিও হতে পারে। এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক বাস্তব উদাহরণ পাওয়া কঠিন।

৪. বিডি বাসবি—বিডি অর্থাৎ পথ। পথে যারা দাঁড়িয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে, তারাই এই বিডি বাসবি। বর্তমানে 'বাসবি' কথাটা এ ভাবেই পতিতা-বৃত্তির পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

দাক্ষিণাত্যে এই বাসবিদের পাশাপাশি একটি শ্রেণী দেখা যায়, তাদের 'জোগতি' বলে। এদের মধ্যে পুরুষদের বলা হয় 'জোগতা'। এরাও দেবদাসীই ছিল। তবে এরা ছিল সন্ন্যাসিনী। কোল্লাপুর অঞ্চলে অবশ্য 'যোগিনী' ও 'দেবদাসী' সমার্থক ছিল। তবে প্রভেদ ছিল এই যে 'যোগিনী' বা 'জোগতি' দেবতার পূজারিণী, অন্যের যৌনকামনা তৃপ্তির উপাদান নয়। 'দেবদাসী'র কর্তব্য যৌনকামনা তৃপ্তি সম্পাদন—পুরোহিতের এবং সমপর্যায়ের প্রভুদের। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধা 'দেবদাসী'দের 'জোগতি' বলা হয়। এরা 'জগ' বা দেবমূর্তি বহন করে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে এবং দেবতার আদেশ ভরের মাধ্যমে প্রচার করে।

এরাই নতুন দেবদাসী সংগ্রহ ও তাদের ব্রত ধারণের আয়োজন করে, কারণ উৎসর্গের সময়ে অন্তত পাঁচজন দেবদাসীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়।

দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ব্যবস্থা বহুকাল ধরেই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বর্তমানেও সম্পত্তি বিভাজনের নীতি মাতৃধারা অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবে সমাজে মেয়েদের স্থান গৌণ। অনেক সমাজ তত্ত্ববিদের মতে দাক্ষিণাত্যে আর্যীকরণের সুদূর প্রসারী ফল এই দেবদাসী প্রথা। দেবী ইয়েলেম্মার (একজন দ্রাবিড়ী দেবী) কাছে উৎসর্গীকরণের দ্রাবিড়ী প্রথার উপর দেবদাসী প্রথাকে আরোপ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। দশম শতাব্দীতে জৈন মন্দিরগুলিতেও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার এটা ছিল সহজ উপায়। ১৯৩০ সাল পর্যন্তও তিরুপতি ও নঞ্জন গুড এর মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ করা হয়েছে।

এ সবের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরের দাসীবৃত্তি। মন্দির পরি-মার্জনা, পূজার উপকরণ সজ্জা, বিগ্রহের সাজসজ্জা ইত্যাদি। কিন্তু আর্যপ্রভাবিত দেবদাসী প্রথার সর্বনাশা দিকটাই এখানেও প্রকট—ধর্মীয় আবরণের আড়ালে দেবদাসীদের উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা।

মন্দির-দাসীরা অদ্যাবধি আছে। তারা মন্দির থেকে বৃত্তি পায় এবং মন্দিরের কাজকর্ম করে। অবসর সময়ে এরা ছোটো ছোটো শিল্পকাজও করে থাকে। কিন্তু 'বাসবি'দের উপর এই নতুন ধর্মীয় চাপটি ধীরে ধীরে তাদের একেবারে কেনাবেচার সামগ্রীতে রূপান্তরিত করেছে।

'বাসবি' ছাড়াও ভারতে পতিতাবৃত্তির ইতিহাসে তিন রকমের পতিতাবৃত্তির নাম পাওয়া যায়।

১। ব্যক্তি সুলে—কোনো ব্যক্তির রক্ষিতা উপপত্নী। অষ্টাদশ শতকের বিদেশী বণিকরা উপপত্নী প্রথাকে খুবই ব্যাপক করে দিয়ে ছিল। পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলেই স্থানীয় মেয়েদের উপপত্নী হিসেবে বাড়িতে রাখতো। এদের সন্তান-সন্ততিরা বর্তমানে ভারতীয় জাতিবিন্যাসে একটা বড়ো অংশ। এদেরই দেখাদেখি স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা উপপত্নী গ্রহণ শুরু করে। বর্তমানে অবশ্য পরিবারভুক্ত উপপত্নী কম দেখা যায়।

২। সমাজ সুলে—একটা সুনির্দিষ্ট পল্লীবাসিনী পতিতা। সর্বশ্রেণীর মানুষেরই তারা ভোগ্যা।

৩। দেবদাসী—মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশেষ ধরনের বারবনিতা। সমাজসুলেদের সঙ্গে এদের প্রধান প্রভেদ হলো এই যে, এদের উপর সামাজিক কলংক আরোপিত হয় না। ব্যাপারটি নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা যদি সমাজে স্বীকৃত হয়, তবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দেবদাসী প্রথার মূল্য সেখানেই। তবু এই দেবদাসীদের জীবন স্বাভাবিক নয় বলেই এই প্রথা নারীচেতনার উপর অত্যাচার বলেই স্বীকৃত।

দেবদাসী সংগ্রহ ও সমাজ-বিন্যাস

সদ্যোবিস্তৃত নাগরিক জীবন দ্রুত গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে. ধর্মের আবরণও একে আর ঢেকে রাখতে পারছে না। ফলে সমাজের নিম্ন সম্প্রদায় এবং নারী সম্প্রদায়ের জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে এক নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

সমাজের সর্বনিম্নশ্রেণী কারা ? ইতিহাসে 'শূদ্র' বলে যারা চিহ্নিত তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। আসলে, Production-relation বা উৎপাদন সম্পর্ক অনুযায়ী এই নিম্নশ্রেণী নানাভাবে নামাঙ্কিত হয়েছে, পরিবর্তিতও হয়েছে। আদিবাসী শ্রেণী, ক্রমশঃ বাধ্য হয়েছে নাগরিক উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ হ'তে, এবং কালক্রমে নানা কর্মপরম্পরায় তাদের কাউকে তুলে নেওয়া হয়েছে সমাজে সমব্যবহার-যোগ্যতার কথঞ্চিৎ উচ্চস্তরে, কাউকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে অস্পৃশ্যতার স্তরে। তাদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ অনুপাতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে পরিবর্তনের ফলে তারা না পেরেছে নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখতে, না পেয়েছে নতুন সমাজে কোনো স্থান। অবশ্য ভারতবর্ষে Schedule tribe-এর চেয়ে Schedule caste-এর অবস্থা অনেক বেশী শোচনীয়। Schedule tribe-এর একটা আলাদা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন আছে, নিজস্ব রীতিনীতি ও আইন ব্যবস্থা নিয়ে তারা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে। কিন্তু Schedule caste-এর নানা শ্রেণীবিভাগ। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য হিসাবে নানা ভাবে এদের সঙ্গে সমাজের উর্ধ্ব-স্তরের সংযোগ। হরিজন আখ্যা দিয়ে এদের কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা হলেও

এই শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পরিণতি হয়েছে ভয়ংকর। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে যাঁরা নাগরিক শ্রেণীপরম্পরায় গৃহীত হয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁরা স্বশ্রেণীর সঙ্গে প্রায়শঃ সম্পর্ক রাখেন নি। ফলে Schedule caste-এর মধ্যে দুটি সমান্তরাল স্রোত প্রবহমান: প্রাপ্ত শিক্ষার আনুকূল্যে একদল উচ্চশ্রেণীতে সমাসীন, অন্যদল আজও অবনত, অপমানিত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা বর্তমানে প্রচলিত দেবদাসী প্রথার সবচেয়ে বড়ো শিকার। কর্ণাটক-মহারাষ্ট্র-গোয়ার ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডে দেবদাসীরা সবচেয়ে বেশী আসে এই শ্রেণী থেকেই।

পূর্বযুগে আর্য অধিকারভুক্ত অঞ্চলে যে দেবদাসী প্রথা ছিল, তা কালক্রমে দূরীভূত হয়েছে। সহজলভ্য বারবণিতাদের প্রাধান্য লাভে, ধর্মের অনুমোদন আর অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। কিন্তু দেবদাসী প্রথা কিভাবে নিম্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তা ভেবে দেখার মতো নিম্ন শ্রেণীর অনার্য লোকদেবতার মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে—মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটকে এর নিদর্শন ছড়ানো। অবশ্য সংস্কৃতির নিয়মই হ'লো এই যে, তা কখনো লোকচেতনার গভীর স্তর থেকে সমাজ-ব্যবস্থার (social structure) উপরিতলে মাথা তোলে, আবার কখনো সমাজের উপরিতল থেকে নিম্নস্তরে চুইয়ে পড়ে। নাগরিক সংস্কৃতি যেমন গ্রামে অনুকৃত হতে থাকে, তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতি নগরে বিশিষ্টতা অর্জন করে এক নতুন রূপের সৃষ্টি করে। এই ভাবেই অনেক প্রথা, অনেক জীবন-চর্যার পরিবর্তন হয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর। মহারাষ্ট্রের ও কর্ণাটকের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের পতিতালয়গুলিতে নিয়মিত ভাবে এই দেবদাসী সম্প্রদায় থেকে মেয়েদের পাঠানো হচ্ছে। কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লীও বাদ যাচ্ছে না। একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এর পশ্চাতে কাজ করে চলেছে। এই মেয়েরা ক্রমেই শহরের পতিতালয়গুলি ভরে তুলছে। আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবেও এরা ব্যবহৃত। মধ্যপ্রাচ্যের বহু অঞ্চলে ভারতীয় শ্রমিকরা উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের এবং স্থানীয় নবধনিকবর্গের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে মেয়েরা ভারতবর্ষ থেকে চালান হয়ে যাচ্ছে তার একটি বড় অংশ এই দেবদাসী সম্প্রদায়। কুরুচিপূর্ণ যৌন-চিত্র ও যৌন-চলচ্চিত্রের একটা ঘৃণিত ব্যবসায় এই সমস্ত অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত প্রসার জমিয়েছে। কেরল অঞ্চলের সমুদ্রবেলা কোভালম্ ও গোয়ার সমুদ্রবেলার ছোটবড়ো হোটেলে অর্দ্ধাবৃত যৌননৃত্য 'ক্যাবারে' এখন প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ক্যাবারে আর্টিস্ট হিসাবে যে মেয়েরা নিযুক্ত হয়, তাদের কাজ যৌন উদ্দীপনাময় নৃত্যপ্রদর্শন

এবং সময়ে সময়ে বেশ্যাবৃত্তি। ধনদেবতা কুবেরের নব মন্দিরের এই নতুন দেবদাসীরা মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত। সম্প্রতি খ্রীস্টান মঠাধিবাসিনীদের নিয়েও অনুরূপ ব্যবসায় চলছে, সংবাদপত্রে তার ব্যাপক উল্লেখ দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়।

কেবল নিম্নজাতীয়দের মধ্যেই প্রচলিত এই দেবদাসী প্রথা বর্তমানে 'মাঙ্গ' ও 'মাহার' জাতির মধ্যে আবদ্ধ! এই জাতির লোকেদের প্রধান উপাস্য দেবী 'ইয়ালাম্মা' বা 'ইয়েলাম্মা'। এই 'ইয়েলাম্মা' সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যাখ্যা হল, 'ইয়েলাম্মা' ছিলেন ঋষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা। এই দেবীকে অনসূকাম্মা, জগদম্বা, দুর্গাভ্যা বা মারিকাম্মা নামেও ডাকা হয়। রেণুকা সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনী আছে।

রেণুকা প্রতিদিন বালুকা-নির্মিত একটি কলস সাপ দিয়ে তৈরী বিঁড়ে বানিয়ে তার মাথার উপরে রেখে, পানীয় জল নিয়ে আসতেন। একদা গন্ধর্বদের জলক্রীড়া করতে দেখে তিনি মনে ভাবলেন, যদি এমনিই একজন গন্ধর্বের সঙ্গে বিয়ে হতো, তবে বেশ সুখে কাটান যেতো। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বালুকা কলস ভেঙে গেল। ঋষি জমদগ্নি ধ্যানযোগে একথা জানতে পেরে পুত্রদের আদেশ করলেন, জননীকে বধ করতে। বারো বছরের বালক পুত্র পরশুরাম পিতার আদেশ পালন করে মাতাকে বধ করলেন। তুষ্ট জমদগ্নি ঋষিপুত্রকে তিনটি বর প্রার্থনা করতে বললেন, ফলে প্রথমেই পরশুরাম মায়ের পুনর্জীবন ভিক্ষা করলেন। তখন ঋষি জমদগ্নি পুত্রকে একজন 'মতঙ্গী' রমণীর মুণ্ড নিয়ে আসতে বললেন। এই মুণ্ডটি দেহে যোজনা করে দেওয়া মাত্র রেণুকা পুনর্জীবন পেলেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে বর্ণিত ধাঁধার 'উত্তমাঙ্গ' এখানে কিন্তু নীচজাতীয় 'মতঙ্গী' রমণীর! এইজন্যই 'মতঙ্গ' জাতির লোকেরা এই দেবীর পূজা করেন। এই দেবীর পুত্র পরশুরামের ভোগের জন্য তারা কন্যাদের দেবীর মন্দিরে উৎসর্গ করেন।

কাহিনীটি ঈষৎ অদল বদল হলেও সর্বত্র প্রায় একই রূপে প্রচলিত। দেবীর উৎপত্তির এই কাহিনী নিয়ে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। একটা ব্যাপক ভৌগোলিক স্থান জুড়ে এই লোকদেবীর পূজা এবং প্রভাব সত্যিই আশ্চর্য। কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, 'ইয়েলেম্মা' নিজেই দেবী রেণুকা, অথবা সেই 'মতঙ্গী' মেয়েটিই দেবী 'ইয়েলেম্মা', যে রেণুকার জীবন দান করেছিল। গোটা কাহিনীতে আসল লোকদেবীকে আর্যত্বের একটা পালিশ দিয়ে নতুন করে চালাবার প্রচেষ্টা হতে পারে।

'কমুক্কন্নু' প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী
তঞ্জাভুর মন্দিরের শেষ দেবদাসী।

ইয়েলেম্মা
কর্ণাটকের লোকদেবী
এই দেবীর মন্দিরেই দেবদাসী
উৎসর্গ হয়ে থাকে।

দেবদাসী উৎসর্গের সময় অপেক্ষারত 'জোগতি' দেবদাসীরা।

সৌন্দাতীতে ইয়েলেম্মার মন্দিরে যাবার পথে একটি মতঙ্গী মন্দির আছে। প্রথমে সেখানে পূজা দিতে হয়। পরে ইয়েলেম্মার মন্দিরে যেতে হয়। এই সমস্ত কারণেই সন্দেহ হয় যে, পুরো লোকাচারটিকে উচ্চবর্ণের লোকেরা একটা পালিশ দেবার চেষ্টা করেছে, যাতে এই 'সুবিধাজনক' প্রথাটির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যায়।

'হরিজন সেবক সংঘ' হরিজনদের মধ্যে পতিতাবৃত্তির প্রসারের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি সমীক্ষা করেন। সমীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ

"it may be remarked that the origin of untouchability may be on account of high freedom in sexual matters among the lower caste women who are despised by higher caste women. For their men are too poor and weak to satisfy their needs. There can be another way of looking at the phenomenon of Devdasi. A Devdasi attains immunity from the state of inauspiciousness of widowhood. Therefore, her presence is liked by the caste Hindus on marriage and festivals. A daughter of a Harijan thus becomes acceptable to other castes in various ways, including her acceptance as a keep or sexual partner who may beget children without any stigma attached on either side. This seems to be a kind of high caste Hindu rationality which satisfy their sexual needs." (A Study into Exploitation of Harijan women.)

দেবদাসীদের রক্ষক ও উপভোক্তা উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই সচরাচর হয়ে থাকে, কারণ তাদের নিজেদের জাতের লোকেরা তাদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। কেবল 'মাঙ্গ' বা 'মাহার' জাতি নয়, 'গোল্লার' ও 'নায়ক' জাতির লোকেরাও দেবদাসী উৎসর্গ করে, এবং তাদের মধ্যেও এই প্রথা চালু আছে।

দেবদাসী নিয়োগের গৌণ কারণগুলির মধ্যে কতকগুলি হ'ল নিম্নজাতীয়দের লোকাচার বা সংস্কারপ্রসূত।

প্রথমতঃ পরিবারে অনেকগুলি মেয়ে থাকলে অন্ততঃ একটিকে দেবতার কাছে দিতে হবে, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এর জন্য মেয়েটির মা-বাবাও বিশেষ দুঃখিত হন না। অবশ্য এর পিছনে একটা গূঢ় কারণ আছে। এতদঞ্চলে

মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি বা বাড়ি ঘরের অংশ পায়। মেয়ে দেবদাসী হ'লে সঙ্গেও অন্য পরিবারে না গিয়ে ঘরেই থাকে, তা ছাড়াও তার উপার্জনের ভাগও পরিবার পায়।

দ্বিতীয়তঃ, কোনো দম্পতি সন্তানহীন হ'লে মানত করে প্রথম কন্যা সন্তানটিকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা ছিল প্রাচীন রীতি। সাত-আট বছর বয়সেই মধ্যেই তাকে উৎসর্গ করতে হতো।

তৃতীয়তঃ, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল দেবদাসী হিসাবে উৎসর্গীকৃত কন্যা পরিবারে পুত্রসন্তানের মর্যাদা পেয়ে থাকে। দেবদাসী উৎসর্গের সময় নিয়ম অনুযায়ী অন্ততঃ পাঁচজন 'জোগতি'কে আহ্বান করতে হয়। এদের ভিক্ষাপাত্রে যথেষ্ট টাকা পয়সা ইত্যাদি ও অন্যান্য উপহারদ্রব্য দেওয়া হয়, যা ঐ দেবদাসীর পরিবারের প্রাপ্য। সুতরাং স্বভাবতই দরিদ্র হরিজনদের উপর এই প্রথার প্রভাব ব্যাপক হতে বাধ্য।

পাততাবৃত্তিলব্ধ অর্থ পরিবার প্রতিপালনের কাজে লাগে বলে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে দেবদাসীর জন্যে বেছে নেওয়া হয়, যাতে যৌবনে সে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য যে মেয়ের পাত্র জোটে না শারীরিক কোনো ত্রুটির ফলে, সে দেবদাসী হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয়। অথবা কোনো দুরারোগ্য রোগের আরোগ্য কামনা করেও কন্যা-উৎসর্গ করা হয় দেবী মন্দিরে। এগুলির নানা চেহারা ভারতের নানা জায়গায়। কোথাও মানতের জট কামানো হয়, কোথাও বা নাক বা কানে ফুটো করে দেওয়া হয়। কিন্তু কন্যা-উৎসর্গের এই প্রথাটি এতদঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়াও কতকগুলি সংস্কার চালু আছে। শুকনো কূপে জল আনার জন্য দেবদাসী মানত করা হয়। আকস্মিক ভাবে মাথার চুলে জট পড়লে সেটা দেবতার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত বলে বিবেচনা করা হয়, ও জট যার মাথায় পড়েছে, সেই বালিকাটিকে দেবদাসী হিসাবে উৎসর্গ করা হয়।

এই সংস্কারগুলিকে আরো বেশি বদ্ধমূল করে তোলার পিছনে কিছু প্রয়াস থাকে। হঠাৎই চুলে জট পড়ে না, মাঝে মাঝে চিট্‌চিটে পদার্থ (মধু, হলুদ জল) চুলে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পিতামাতা নিজেদের স্বার্থেই এই কাজ করেন। কারণ, বালিকাটি দেবদাসী হলে তাদের লাভ দুই ভাবে। সম্পত্তি বাড়িতেই রইল, উপরন্তু দেবদাসীর প্রাপ্যও ভোগ করার অধিকার রইল। গ্রামের

প্রধান ব্যক্তির সহায়তাও লাভ করা গেল। একটি মেয়ের শরীরের বিনিময়ে এতখানি লাভের আশা ছাড়া কঠিন।

পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা এ প্রথাকে সমর্থন করে চলেছেন প্রায় প্রকাশ্যেই। কারণ, তাঁদের আর্থিক প্রাপ্যও এই উৎসর্গের মাধ্যমে যথেষ্ট। দেবদাসীর উপার্জনের একটা অংশ নিয়মিত ভাবে এঁরা পান। তা ছাড়া ধর্মের আবরণে একাজ চালিয়ে যেতে পারলে আইন নাগাল পায় না।

বৃদ্ধা জোগতিরা দেবদাসী সংগ্রহ করে। তাদের নিজেদেরও পাওনা থাকে। শাড়ি, জামা ও অর্থ সবাই পায় উৎসর্গ উৎসবে। বর্তমানে এদের দিয়েই নারীপণ্য সংগ্রহের কাজ চলে। এরা দেবতার 'ভর' হবার উপায় স্বরূপ। অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হ'লেও, একটা কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে একটি সম্মেলনে গৌরাবাঈ নামে জনৈকা মহিলা যখন এই প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছিলেন, তখন উপস্থিত একজন 'জোগতি' হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকে। গৌরাবাঈ জিজ্ঞাসা করলেন,

'তুমি কে ?'

উত্তর হ'ল, 'আমি ইয়েলেম্মা'।

'যাক, তুমি এসেছো ভালই হয়েছে। কেন তুমি আমাদের মেয়েদের এপথে নামাচ্ছ ?'

'চুপ ! আমায় প্রশ্ন কোরো না, সহ্য করবো না।'

'ইয়েলাম্মা ! তুমি যদি পৃথিবীর মা হও, তবে কেবল নীচু জাতের মেয়ে নিচ্ছ কেন ? বেনিয়া বা ব্রাহ্মণের ঘর থেকে নিচ্ছ না কেন ?'

হঠাৎ কাঁপুনি থামিয়ে মহিলাটি বললেন, 'যা করছো কর।'

এ ধরনের সুযোগ সর্বত্র ঘটে না, কাজেই সংস্কার ক্রমশঃ চালু হয়েই চলেছে। এই সংস্কার চালু হতে থাকে লোকমুখেই, পরে অবশ্য প্রচারযন্ত্র ধীরে ধীরে একাজটি হাতে তুলে নেয়। এভাবেই একদা সর্পদেবী মনসা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারের হাত ধরে আর্যদের সভায় প্রবেশ করেছেন, বনদুর্গা মঙ্গলচণ্ডী ব্যাধের ঘর থেকে উন্নীত হয়ে রাজসম্মান পেয়েছেন, আর 'সন্তোষী মা' ও 'বাবা তারকনাথ' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছেন নগরবাসী জনজীবনে। চিন্তাশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে কেবল সংস্কারকে জীইয়ে রাখলে অনেকেরই লাভ, দেবদাসীরাও এভাবেই লাভের কড়ি গুনে দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে।

বর্তমান যে সমস্ত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ইয়েলেম্মা যুগপৎ কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের লোকদেবী। কামাপুরের কমলেশ্বরী,

খাণ্ডোবার ভাগ্যমুরলী, মঙ্গেশীর শান্তা দুর্গা ও অন্যান্য লোকদেবীদের মন্দিরেও এই দেবদাসী প্রথা চালু আছে। এ ছাড়া হনুমান মন্দির ও জমদগ্নি মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু আছে, যদিও এ'রা লোকদেবী নন। হনুমান তাঁর ব্রহ্মচারী কুমারজীবনের জন্য পূজিত ও প্রশংসিত। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নারীভোগের ব্যবস্থার ব্যাপারটি কৌতূহল উদ্রেক করে।

কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলার সৌন্দত্তী শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সৌন্দত্তী মন্দিরে (ইয়েলাম্মা গুড্ড) দেবদাসী উৎসর্গ হতো বলে জানা গেছে। কিন্তু বর্তমানে এখানে দেবদাসী উৎসর্গ তত বেশী হয় না। এর দুটি কারণ : এক—এই প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা। দুই—সৌন্দত্তী যাবার পাথেয় খরচ যথেষ্ট বেশী, এ ছাড়া মন্দিরের পুরোহিতরা প্রচুর টাকা দাবী করে। কারণ, উৎসর্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পুলিশকে ঘুষও দিতে হয়। এই মন্দিরে উৎসর্গীকৃত দেবদাসীরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়। এখানকার উৎসর্গের খরচ প্রায় ৪000 টাকা থেকে ৫000 টাকা।

বর্তমানে সৌন্দত্তীর কাছাকাছি উগারগোলে ইয়েলাম্মা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ হয়। অবশ্য সৌন্দত্তী শহরের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে দেবদাসী প্রথা ব্যাপকতা কমেছে। ধর্মের আবরণ ছাড়াই বর্তমানে এখানে বেশ্যাবৃত্তি চলেছে অবাধে। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এখনও প্রায় একই রকম।

বেলগাঁও জেলার রামদুর্গ তালুকে ১০২টি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী। এ অঞ্চলে দেবদাসীপ্রথা প্রবলভাবে বিরাজমান। হিসাবমতো ৩00 জন দেবদাসী আছেন এবং প্রতি বছর নতুন আরো অনেকে যোগ দিচ্ছে এদের দলে। এই তালুকে প্রতি বছর প্রায় ১00 জন এই বৃত্তি গ্রহণ করে। এরা সকলেই অবশ্য স্থানীয় নয়, বেলগাঁও, বিজাপুর, বোম্বাই এসব অঞ্চলের শহর বা শহরতলী থেকে অনেকে এসে মন্দিরে এই বৃত্তিতে উৎসর্গীকৃত হয়।

রামদুর্গ থেকে ১0 কিলোমিটার দূরে গোন্নগর নামে একটি গ্রাম সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্রামের হরিজন পাড়ার ১৯টি পরিবারের মধ্যে ১১টি পরিবার আছে, যারা দেবদাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত। ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ১৭৪২ জন লোকের মধ্যে ১৪0 জন হরিজন। এই লোকগণনায় দেবদাসীরা নিজেদের দেবদাসী বলেই পরিচয় দিয়েছে।

বেলগাঁও জেলায় তামাক উৎপাদন কেন্দ্র নিপানীতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২৭000। এর মধ্যে একটা বড় অংশ মেয়েরা। এদের মধ্যে

অধিকাংশই হরিজন। এই অঞ্চলটি প্রধানতঃ বোম্বাই বাজারে পতিতা সরবরাহের কেন্দ্রস্বরূপ। এই শহরের ৮০০ জন পতিতার মধ্যে ২০০ জনই দেবদাসী। এখানে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা তামাকের কারখানায় কাজ করে। মেয়ে শ্রমিক যারা কারখানায় কাজ করে, তারা দৈনিক পাঁচ টাকা হারে মজুরী পায়। রাত্রে তারাই আবার বেশ্যাবৃত্তি করে। দৈনিক দশ টাকা হিসাবে তারা গড়ে উপার্জন করে।

বেলগাঁও জেলারই আঠানী বোম্বাই পতিতালয়ের নারী সরবরাহের আর একটি কেন্দ্র। তেরাদল-মাঙ্গসুলী-আঠানী, তিনটি অঞ্চল এক ত্রিভুজাকৃতি ভৌগোলিক অঞ্চল তৈরী করেছে। বেশ্যা চালানকেন্দ্র হিসাবে এই অঞ্চলগুলি প্রসিদ্ধ।

আঠানীর লোকসংখ্যা ৫০,০০০। তার মধ্যে ৫০০০ হরিজন। ৫০০ পরিবারে এরা বিভক্ত। এই হরিজনদের মধ্যে শতকরা ৯৮টি পরিবারই পতিতাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি পরিবারের অন্তত তিনটি মেয়ে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত। পতিতাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১০০০। এই সংখ্যায় অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত পতিতাদের ধরা হয় নি। আঠানীর লোকসংখ্যা অনুযায়ী পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্তদের হার অনেক বেশী।

মুগলকোড, মাঙ্গসুলী, কোকটনুর, তেরদাল কুড়চি এবং আঠানী শহরের নিকটবর্তী শংকর হাট্টি, থাব্বুর, ইত্যাদি গ্রামে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে দেবদাসী-উৎসর্গ করা হয়। 'মাঙ্গসুলী' 'মাঙ্গ' জাতীয় পতিতাদের একটা বড়ো উৎসর্গকেন্দ্র। দেবদাসীদের নামে এই নামটিই চালু হয়ে গিয়েছে অঞ্চলটির।

শংকরহাট্টি গ্রামের ৫০০ হরিজন ৫০টি পরিবারে বিভক্ত। এখানে বছরে ৮ থেকে ১০ জন দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। হরিজন পল্লীতে এর জন্যে একটি মন্দির আছে। তাছাড়া নিকটবর্তী থাব্বুর গ্রামেও মন্দির আছে। মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত, এর ঐশ্বর্যও দেখবার মতো। দেববিগ্রহের লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার ও রৌপ্যালংকার আছে। এছাড়া পূজা নিবেদন কারিণীদের দেওয়া প্রায় ১০০০ শাড়ি আছে যেগুলি মন্দিরের ভিতরের ছাদ থেকে পুঁটলি করে ঝোলানো রয়েছে। এই সব তথ্য মন্দিরের জনপ্রিয়তার নিদর্শন।

বিজাপুর শহর ও বিজাপুর জেলার সমস্ত তালুকেই দেবদাসী প্রথা প্রবল-ভাবে প্রচলিত। 'দেবদাসী বলয়' নামে যে অঞ্চলটি কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থল, তার প্রধান অংশ এই জেলাতেই বর্তমান। এই জেলার প্রধান

শহরগুলিতে পতিতা পল্লী অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শহর ছাড়া নিকটবর্তী গ্রামগুলিতেও দেবদাসী ও অন্য পতিতাদের সমারোহ ব্যাপক।

অথর্গ অঞ্চলে ১৫০০ লোকসংখ্যার মধ্যে ২৫০ জন হরিজনের তিরিশটি পরিবারের বেশ একটি বড়ো সংখ্যা দেবদাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত।

টিকোটার হনুমান মন্দিরে এ জেলার একটা বড়ো দেবদাসী উৎসর্গের কেন্দ্র আছে। প্রতিবছর এপ্রিল মাসের উৎসবে দেবদাসীদে রযথেষ্ট সমারোহ সহকারে উৎসর্গ করা হয়।

হোনৃসনুর জেলা দেবদাসী ও সাধারণ পতিতা সম্প্রদায়ের জন্য বিখ্যাত। উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন নাটকের দলে এখান থেকে মেয়ে সংগ্রহ করা হয় নৃত্যগীত ও অভিনয়ের জন্য। গদাগ (Gadag) ও হাভেরি প্রভৃতি অঞ্চলে অভিনয় শিল্পের জন্য এই অঞ্চলের মেয়েদেরই বেশী পছন্দ করা হয়।

এই সমস্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বেশ্যা-বৃত্তির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত—মহারাষ্ট্রেব সীমান্তবর্তী অঞ্চল বলে, এবং বোম্বাই বাজারের কাছাকাছি বলে এই অঞ্চলে মেয়ে চালানী ব্যবসায়ের সুবিধা অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত—এতদঞ্চলের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের খ্যাতি।

তৃতীয়ত—গ্রামাঞ্চলে উচ্চবর্ণের অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়ে চলায় হরিজন পতিতারা নগরপ্রান্তে আশ্রয় নিচ্ছে।

চতুর্থত—হরিজন যুবকদের কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় পরিবারের মেয়েরা পতিতা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

প্রশ্ন হ'লো, নগরে পতিতাবৃত্তির এই ক্রমবর্ধমান উদাহরণের কারণ হিসাবে দেবদাসী প্রথা কতখানি দায়ী? বর্তমানে বাজারের পতিতালয়গুলি যদিও আর ধর্মের অপেক্ষা রাখছে না, তবু এই নারীব্যবসায়ের প্রাথমিক সোপান হিসাবেই দেবদাসী প্রথা চালু হয়েছিল। এখনো যে সমস্ত জায়গায় আছে. তা এই কারণেই আছে। মেয়েরা এই বৃত্তি গ্রহণ করছে ইচ্ছাপূর্বক, কারণ শারীরিক পরিশ্রম কম করে বেশি টাকা উপার্জন করা এ ব্যবসায়ে সহজ, পরিবারগুলিও আর্থিক কারণেই মেয়েদের নিয়োগ করছে এই ব্যবসায়ে।

দেবদাসী-উৎসর্গ প্রথার নিয়মাবলী অদ্ভুত। সচরাচর আট থেকে দশ বৎসর বয়সের বালিকাদের এ প্রথায় উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য বিবাহিত মেয়েরাও আসে, আবার ১৭।১৮ বৎসর বয়সের মেয়েরাও আসে উৎসর্গীকৃত হতে। তবে শিশুকালে উৎসর্গ করাই বিধি। 'জোগতি' বা অবসর প্রাপ্ত দেবদাসীরা

কোনো এক উৎসবের সময় 'ভর' প্রাপ্ত হয় এবং কোনো একটি বিশেষ পরিবারের নাম করে, যার থেকে একটি মেয়েকে দেবদাসী করা হবে। এমন কি, কোন্ মেয়েটিকে নেওয়া হবে, তাও সে বলে দেয়। বেশ বোঝা যায়, ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা আগে থেকেই 'জোগতি' কে এ সম্বন্ধে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখেন।

যে সমস্ত অঞ্চলে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ শক্তিশালী, সেখানে মেয়েটির আত্মীয়রা মেয়েটির গর্ভবতী হবার ব্যবস্থা করে। পরে তারা গ্রামের কর্তাদের কাছে দাবি জানায় যে, হয় তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা তাকে দেবদাসী হবার অনুমতি দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে দায়ী লোকটি উচ্চবর্ণের, এবং বিয়ের ব্যবস্থাও বেশ খরচ সাপেক্ষ। বরং দেবদাসী হবার অনুমতি দেওয়া সহজ, কারণ তার ফলে মেয়েটি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সাধারণের ভোগ্যা হয়ে থাকবে।

দেবদাসী উৎসর্গ উৎসবের চেহারাটি প্রায় বিবাহ উৎসবের মতো। এই উৎসর্গীকৃত মেয়েরা সচরাচর যৌবনারম্ভের পূর্বেই দীক্ষিত হয়। নির্দিষ্ট দিনে, (পূর্ণিমা তিথিই প্রশস্ত বলে বিবেচনা করা হয়) হরিজন পল্লীতে অন্য দেবদাসীরা উপস্থিত হয়। অঙ্গে তৈললেপন করে 'জোগতি'দের জন্য নির্দিষ্ট 'জগুলা' বাভীতে (জোগতিদের কূপ) উৎসর্গ করার আগে ভাবী দেবদাসীকে স্নান করানো হয়। এই কূপ যদি মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত হয় তবে তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে কেবলমাত্র নিমপাতার মালা ধারণ করে সেখানে যেতে হবে স্নান করার জন্য। তারপর সমবেত দেবদাসীদের ভিক্ষাপাত্রে আহার্য পরিবেশন করতে হয়।

স্নানের পর নববস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে যেতে হয়। পুরোহিত নির্দিষ্ট দক্ষিণার বিনিময়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। দেবতার পূজা নিবেদন করে প্রসাদমাল্যস্বরূপ 'তালী' অথবা স্থানভেদে 'মঙ্গলসূত্র' পুরোহিত নিজেই তাকে পরিয়ে দেন, অথবা তার হাতে দেন। তখন সমগ্র পরিবার বাড়ি ফিরে আসে এবং পাঁচটি মুক্তাসদৃশ কাচের পুঁতি ঐ সূত্রে গেঁথে মেয়েটিকে পরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরে সমবেত মেয়েরা কন্যার মাথায় অক্ষত চাল ছুঁড়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বরের স্থান নেয় একটি ছোটো তরবারি। মন্দিরভেদে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য বিভিন্ন।

এই অনুষ্ঠানের জন্য বছরে চারটি পূর্ণিমা তিথি নির্দিষ্ট। (১) রণ্ডে হুন্নিমে (বারবণিতাদের পূর্ণিমা); (২) ভারত হুন্নিমে; (৩) হোলি হুন্নিমে; এবং

(৪) মুথাইডে হুম্বিমে বা গরথী হুম্বিমে (গৃহবধূদের পূর্ণিমা)। এই চারটি পূর্ণিমাতেই দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়।

এই সময়কার দৃশ্যটা এই, দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে যাত্রীরা আসছে। মাইলখানেক লম্বা গাড়ির সারি। সারি সারি নগ্নদেহ নিমপাতার মালা পরা ছোটো ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসর্গিত হবার জন্য, শুকনো উপবাসখিন্ন মুখ, স্নান করানো বলির ছাগশিশুর মতো! একবার দেবদাসী হয়ে গেলে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ।

দেবদাসী-উৎসর্গ করা হয় ইয়েলেম্মার মন্দিরেই সবচেয়ে বেশি। তুলসী গেরির হনুমান মন্দিরে, টিকোটার হনুমান মন্দিরেও দেবদাসীদের উৎসর্গ করা হয়। এ ছাড়া জমদগ্নি মন্দিরে ও পরশুরামের মন্দিরেও দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গের নিয়মাবলী মোটামুটি একই, তবে হনুমান মন্দিরে পুরোহিত দেবতার পূজা করে দেবদাসীর বাঁ হাতে অথবা বাঁ দিকের বুকে তপ্ত মুদ্রার ছাপ এঁকে দেন।

এই উৎসর্গীকৃত দেবদাসীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে স্থানীয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যথোচিত (অর্থাৎ ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা) মূল্য দিয়ে তাদের সঙ্গে প্রথম সহবাসের সুযোগ পান।

এই দেবদাসী উৎসর্গ উৎসবটিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং তাতে অংশগ্রহণ করে বোম্বাই অঞ্চলের পতিতালয়ের মালিকরা, কর্ণাটকের সংস্কৃতি প্রচার কেন্দ্রগুলি, এবং বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মেয়ে কেনা-বেচার ব্যবসা যারা করে তারাও। কারণ সহজেই অনুমেয়।

এই অঞ্চলের মেয়েদের দেহসৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও নৃত্য-গীতবাদ্যে স্বাভাবিক পটুত্বের খ্যাতি আছে। সম্ভবতঃ আদিলশাহী সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে বিজাপুরের সংস্কৃতি ও ভোগবিলাসের ব্যাপক বিস্তার এই মেয়েদের মধ্যে বহু যুগ ধরে প্রসারিত হয়ে এসেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বারনারীরা তাদের নৃত্যগীত পটুত্বের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ফলে একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অপরদিকে মহানগরীর বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য জীবন যাত্রার হাতছানি এই অঞ্চলের মেয়েদের গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যদিও সাধারণ জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তবু মুষ্টিমেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ হিন্দুধর্ম রক্ষণের নামে তাঁদের নিজেদের স্বার্থ (Vested interest) রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। মন্দিরের অধিকার এবং

পবিত্রতা রক্ষার নামে তাঁরা আসলে মন্দিরের সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্টই করেছেন।

এর বিরুদ্ধে Justice Party-র নেতা এবং পানাগল-এর রাজা লোকহিতের জন্য মন্দির রক্ষার এক নতুন উপায় অবলম্বন করেন। "Hindu Religious Endowment Act'-এর মাধ্যমে যাতে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার পরিচালনার ভার লোকহিতের জন্যই হয় তার জন্য চেষ্টা করেন এই Justice Party। এই আইনের বলে সরকার মন্দিরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার অর্জন করে। এই আইনের উপর ভিত্তি করে শ্রীমতী রেড্ডী তাঁর একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রস্তাবটিতে বলা হলো 'হিন্দু রিলিজিয়াস এনডাওমেণ্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী ইনাম প্রাপ্ত দেবদাসীদের ভোটাধিকার থাকবে। এই ভাবে সমস্যাটির 'মূল' উৎসাদনের একটা উপায় হল, কারণ অতঃপর দেবদাসীরা নিজেদের দায়িত্বে এই প্রথার উৎসাদন দাবী করার একটা সুযোগ পেলেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের মন্দিরে উৎসর্গ করার অপরাধে শাস্তিদানের যে ব্যবস্থা আছে, এই ধারা দুইটিরও সংশোধনের জন্য ডাঃ গৌর প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা আইনের নির্দেশ না মেনে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের উৎসর্গে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষকে বাধ্য করেছে কিন্তু এই সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে রূপান্তরিত হবার পর ১৮ বছরের মেয়েদের উৎসর্গ করা শুরু হলো। এ যাবৎ ১৮ বছর বয়সে দেবদাসীকরণের পর যদি তার বিবাহ হয়ে থাকে, তবে তা আইনসম্মত হবে, এ ব্যবস্থা ছিল। এই দেবদাসী ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য শ্রীমতী রেড্ডী নতুন করে প্রস্তাব করলেন, 'যদি এই দেবদাসী বা নর্তকীর জন্য কোনো ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হয়, তবে এই সম্পত্তির অধিকারিণীদের ভোটাধিকার থাকবে। তাদের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবে এবং মন্দিরের তার উপর কোনো অধিকার থাকবে না।'

প্রস্তাবটির কথা বিশেষভাবে পুনরুল্লেখ করার কারণ এই যে, দেবদাসীরা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত থাকাকালে সম্পত্তি হিসাবে যা পেত, তা মাসোহারা হিসেবে, অথবা স্থায়ী ভূ-সম্পত্তির আয় হিসেবে। যতদিন তারা ঐ পদে নিযুক্ত থাকতো, ততদিন এই আয় ভোগ করত, কিন্তু বার্দ্ধক্যে পদচ্যুত হবার পর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া তাদের উপায় থাকত না। এই জন্যই দেবদাসীরা দেবদাসী সংগ্রহের চেষ্টা করত, কারণ পালিতা কন্যা অনেক সময় পালিকা

মাতার প্রতিপালন করত। অথবা যাদের সন্তান জন্মাত, তারা সন্তানদের দ্বারা প্রতিপালিত হতো। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব যাতে দেবদাসীদের অন্য মেয়েদের দেবদাসীবৃত্তিতে প্ররোচিত করতে বাধ্য না করে, সে জন্যই শ্রীমতী রেড্ডী এই প্রস্তাবটির উপর জোর দিয়েছিলেন।

এই প্রস্তাবটি আইন হিসাবে প্রণয়ন করা হলো ১৯৪৭ সালের Madras Act XXXI (a Supplementary Act) হিসাবে। এর দ্বারা মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ সম্পূর্ণ বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হ'লো।

অবশ্য ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা বিলুপ্তির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু বর্ণভেদ প্রথার ব্যাপক প্রচলন এবং ধর্মীয় সংস্রবের ফলে এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় নি।

১৯০৬-০৭ সালে হরি সিং গৌর বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনলে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কাছে বিষয়টি উপস্থাপিত করেন।

১৯১২ সালে এই সামাজিক দুষ্টক্ষতটিকে উৎসাদিত করার উদ্দেশ্যে তিনটি আইন প্রস্তাবিত হয়। মানেকজী দাদাভাই, আম্বোলকার এবং Madge এই প্রস্তাব তিনটির জনক। এই প্রস্তাব তিনটিকে অনেকে সমর্থন করলেও প্রস্তাব-গুলিকে গোপনে প্রত্যাখ্যান করা হলো। কারণ উৎসর্গীকৃত মেয়েদের উদ্ধার করে আশ্রয় দেবার মতো কোনো হিন্দু আশ্রম নেই। সেই সময় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের দাবী জানিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে হরিসিং গৌর বোম্বাই বিধান সভায় ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর প্রস্তাবের অনুরূপ একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বোম্বাই বিধান সভার প্রতিনিধিগণ ডাঃ গৌরকে এর জন্যে নিন্দা করেন এমন কি তাঁকে অহিন্দু মিশনারী বলেও আখ্যা দেন।

অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ কঠোরভাবে বলবৎ হওয়ায়, অভিভাবক বা মন্দির কর্তৃপক্ষ কেউ ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের উৎসর্গ করতে সাহস পেল না। অবশ্য ১৮ বছরের অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেবদাসী উৎসর্গের প্রথা চালু থাকল। এইভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের শাশ্বত নির্দেশটি সুকৌশলে পালটে গেল। শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী এই চালাকিটি ধরে ফেলেন। তাই তিনি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলেন—

> "কোনো রকম বয়সসীমা নির্দ্ধারণ করে এ প্রথাকে বদলানো যাবে না বা এই মেয়েদের দুঃখ দূর করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত এই প্রথা বলবৎ থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত ধর্মকথার মাধ্যমে এই অশিক্ষিত জনগণকে

বোঝানো হবে যে, দেবতা তাঁর সেবার জন্য দাসী কামনা করেন—ততদিন পর্যন্ত কোনো আইন কোনো কাজেই লাগবে না। বাইরে থেকে যতই আইন করা হোক ; দণ্ডবিধিকে যতই নতুন বিধি দ্বারা ব্যাপক করা হোক, মন্দিরের প্রথা ও পরিচালনার আভ্যন্তরীণ সংস্কার না হ'লে এ দুর্নীতি দূর হতে পারে না।"

ডাঃ রেড্ডীর মূল বক্তব্য ছিল, 'অশিক্ষা ও কুসংস্কার দারিদ্র্যের সহযোগে এই প্রথা চালু রাখতে সাহায্য করে।' এই দারিদ্র্য মোচনের উপায় হিসাবে তাঁর প্রস্তাব দেবদাসীদের ভূসম্পত্তি ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত করা যে ন্যায্য ছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। মহীশূর রাজ্যের মতো কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহীশূর রাজ্যে যে ঘোষণাটি করা হয়েছিল, তা হ'ল—

"The Government now observes that whatever might have been the original object of the Devdasi Institution in temples, the state of immorality in which these temple servants are now found, fully justifies the action taken by them in excluding the Devadasis from every kind of service in sacred institution like temples.

When land or other items have been specially granted to any individual, the government direct that such Inams be confirmed under Rule VIII, clause F, of the Inam rules to the holders thereof as parmanent and alienable property, subject to the payment of quit rent as laid down therein. The quit rent thus imposed will be credited to the government and an equivalent amount will be granted as cash Inam to the temple concerned."

এই ঘোষণা দ্বারা দেবদাসী নিয়োগের প্রথাকে বন্ধ করে দেবার সরকারী প্রচেষ্টা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। কারণ এই ঘোষণা নিম্নবর্ণের মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণাসঞ্জাত একটি মানবতা তথা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী একটি সামাজিক কু-প্রথার অবসান ঘটাতে চেয়েছে।

মহীশূর সরকারের এই ঘোষণা মাদ্রাজ সরকার প্রবর্তিত আইন ও বোম্বাই সরকারের প্রবল প্রচেষ্টার ফলে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে যে বিপুল জনমত সংগঠিত করেছিল, তাতে প্রাথমিক ভাবে দেবদাসী প্রথা সম্পূর্ণ রহিত হয়। শ্রীমতী রেড্ডী আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন,

"I am glad that this time-old Devadasi system in the Hindu temples as well as dedication of girls to Hindu idols have been totally abolished by two measures, Act no. 5 of 1929 and Prevention of dedication Act of 1949"

দেবদাসী প্রথা এবং ইহার নিরীক্ষা

সম্প্রতি দেবদাসী সম্প্রদায় নিয়ে অনুসন্ধান এবং দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। অবশ্য উত্তর ভারতে এখনো পর্যন্ত এই ধরনের আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। এখনো বহু শিক্ষিত ব্যক্তি দেবদাসী প্রথাকে রোমান্টিক মানসিকতায় রঙিন করে দেখতে ভালোবাসেন। ইদানীং নামজাদা নৃত্যশিল্পীরাও দেবদাসী প্রথার সমর্থনে বলতে শুরু করেছেন, 'নৃত্যশিল্প ও নৃত্যচর্চার জন্য এই উন্নত প্রথাটিকে' নাকি কালিমালিপ্ত করে দেখানোর হচ্ছে। আরো দুর্ভাবনার বিষয় এই, যে ধর্মীয় কুসংস্কারের পশ্চাৎপটে যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী,সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য যাতে প্রকট না হয় তার জন্যেই ধর্ম ও কুসংস্কারকে মানুষের মনে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা হচ্ছে। যুবক-যুবতীদের সুন্দর পোশাকে 'বাবা তারকনাথের 'শ্রাবণী মেলায় যোগ দান বা 'সন্তোষী মাতার' পূজোর বারোয়ারি রূপ নেওয়া এ-সবই ঐ একই কারণে ঘটছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য যাতে প্রতিবাদে সোচ্চার না হতে পারে তার জন্য জনগণের কণ্ঠকে ধর্মের অহিফেন দিয়ে নিস্তেজ করে ফেলা এই সব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ কল্পে অদ্যাবধি যে সমস্ত ব্যক্তি আন্দোলন বা সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী। এই অসাধারণ মহিলা আজীবন নারীসমাজের মুক্তি সাধনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব সামাজিক মর্যাদার অভাব, সব কিছু যে ভাবে নারী সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে, তার

থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চিকিৎসক ছিলেন।

ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর আত্মজীবনী আকারে ক্ষুদ্র হলেও বিশিষ্টতায় অতুলনীয়। চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য সমাজ ও পরিবারগত বাধা অতিক্রম করতে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তার বিবরণ পড়লে বোঝা যায় যে, সমাজে নারীর স্থান বলে যে আসনটি আমরা চিহ্নিত করে দিয়েছি, তা বস্তুতঃ অনেক নীচে। স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব, শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার এবং মেয়েদের অন্যান্য সমস্ত ত্রুটিগুলোর মূল যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আপন কর্মক্ষেত্ররূপে বিধানসভাকেই তিনি বেছে নেন।

মাদ্রাজ বিধান সভায় তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা সদস্য। পরে তিনি বিধান-সভার সহঃ সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই যৌথ দায়িত্বের বলে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা তাঁকে মেয়েদের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিল। প্রথমাবধি তিনি নারীশিক্ষা এবং নারীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরপর নানা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপৃত ছিলেন।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে শ্রীমতী জোসেফাইন বাটলার নারীপণ্যের ব্যবসায় নিরোধের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে পার্লামেণ্টে আইন করা হয়েছিল যে, স্বেচ্ছাক্রমে যারা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করবে, তাদের নাম পুলিশের খাতায় রেজেস্ট্রী করা হবে এবং এই বৃত্তিকে অন্য বৃত্তির সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। এই আইনের ফাঁকটা লক্ষ্য করার মত। যে মেয়েরা শিক্ষকতা, কারখানার মজুরী, দোকানের বিক্রেত্রী বা দাসীবৃত্তি নিতে ইচ্ছুক, তারা শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে যে মূল্য উপার্জন করে, তার মর্যাদা স্বীকৃত। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি এধরনের শ্রমের সমগোত্রীয় নয়। পরন্তু, স্বেচ্ছাক্রমে কেউই বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে না। তা কেবল সামাজিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলে নয়, তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ও আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থী বলে। সামাজিক কলঙ্ক, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে মেয়েরা পতিতাবৃত্তিতে নেমে আসে। সে জন্যই পার্লামেণ্টের এই আইনের বিরোধিতা করে শ্রীমতী বাটলার দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে,

"রাষ্ট্রের কর্তব্য সমস্ত ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক জীবনকে উন্নত করা। এ ধরনের কদাচারকে স্বীকার করলে নৈতিক জীবনের অধঃপতন সূচনা করা হয়। প্রকারান্তরে বে-আইনী নারীদেহ ব্যবসায়কে স্বীকার করে রাষ্ট্র অন্যায় কাজ করছে।"

শ্রীমতী বটলারের নেতৃত্বে এই সংগ্রামের ফলে ১৮৫৫ সালে ইংলণ্ডে পতিতালয়গুলি নিষিদ্ধ হয়। এই আইন কেবল ইংলণ্ডের ভূখণ্ডে নয়, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতেও প্রযোজ্য ছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। উপনিবেশের সমাজব্যবস্থায় পতিতাবৃত্তির প্রধান কারণ ছিল কেবল তৎকালীন সামাজিক অত্যাচার নয়, অর্থনৈতিক শোষণ। আমরা অনেক সময় ভুল করে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড়ো শহরের পতিতালয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা করি যে এই পতিতারা পুরুষানুক্রমে এই বৃত্তি গ্রহণ করে আসছে। কথাটা অংশতঃ ঠিক হলেও সম্পূর্ণ নয়। চা-বাগান, কয়লাখনি এবং অন্যান্য খনি, রেলপথ তৈরীর মজুরদের বস্তি, সর্বত্র যে ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তির পরিবেশ তৈরী করা হয়, তা যদি সুনির্দিষ্ট পতিতালয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ও, তবু এই প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তি যে অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী প্রভুদের অত্যাচারেরই কুফল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। ভারতে সর্বত্র পতিতালয় নিষিদ্ধ হয় ১৮৫৫ সালের পার্লামেণ্ট আইনে, কিন্তু এই ব্যাপক পতিতাবৃত্তির উপর তা প্রয়োগ করবার কোনো উপায় ছিল না। শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী এই আইনের ফাঁকটা ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে, ভারতীয় মন্দিরগুলি সম্বন্ধে এই আইন কোনোমতে প্রযুক্ত হতে পারছে না। ফলে এই প্রথা ধীরে ধীরে মন্দিরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ শহরেই পতিতালয়গুলি প্রকাশ্যে 'দেবীপল্লী' বলে অভিহিত হতে শুরু করেছে। ভারতীয় ধর্মজীবনের এই দূষিত ক্ষতটির সমূল উৎপাটনে শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী মনোনিবেশ করলেন।

কাজটি বড়ো সহজ ছিল না। সমাজের মুকুটমণিস্বরূপ পুরোহিত, রাজন্য-বর্গ ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির মৌন সমর্থন যে প্রথার পক্ষে, আইনের ফাঁক সযত্নে খুঁজে বের করে আইনকে ফাঁকি দেবার যে সুযোগ সকলে নিচ্ছে, সে সমস্ত উপেক্ষা করে 'প্রাচীনতম পেশা'র এই মূল উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া প্রায় বিষধর সর্পের বিবরে হাত ঢুকিয়ে দেবার মতই ভয়াবহ ছিল। বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন করার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এক সময় অপঘাত মৃত্যুর আশংকায় শংকিত থাকতে হয়েছে। এ

অবস্থায় শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী যে মনোবল ও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আশ্চর্য। এই প্রথা সম্বন্ধে তিনি বিধানসভায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তার সারমর্ম হল এই—

"শিশুকাল থেকেই বালিকাদের মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রয়, দান বা অন্য কোনো ভাবে হাজির করা হয়। তাদের নৃত্যগীত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে আঠারো বছর বয়সে দেবসমক্ষে তাদের উপস্থিত করা হয়। আঠারো বছর বয়সটি খুবই বিবেচনা পূর্বক করা হয়েছে, কারণ আঠারো বছর বয়সে যৌন সহবাসের সম্মতি দিলে তা আইনে আটকায় না। এই বালিকাদের কুমারী থাকতে দেওয়া হয় না। এরা মন্দিরের দেবদাসী হলেও এদের প্রাপ্য নিতান্ত স্বল্প। অনেকে অবশ্য রূপ ও গুণ অনুপাতে ভূসম্পত্তির মালিকও হতে পারে রাজা বা পুরোহিতের সহায়তায়, কিন্তু সাধারণভাবে এরা খুবই দরিদ্র। বেশ্যাবৃত্তিই এদের জীবিকা। সেজন্য মেয়েদের এই সমস্যাটি নিশ্চিত ভাবেই সামাজিক সমস্যা, ধর্মকেন্দ্রিক সমস্যা নয়।"

এ সম্বন্ধে আরো বহুবিধ উদাহরণ দিয়ে শ্রীমতী রেড্ডী যে প্রস্তাবটি করেন, তা হ'ল এই—

"The council recommends to the government to undertake legislation or if that for many reason be impracticable, to recommend to the Central Government to undertake legislation at a very early date to put a stop to the practice of dedicating young girls or young women to Hindu temple, which has generally resulted in exposing them to an immoral life"

স্থানীয় সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করায় শ্রীমতী রেড্ডী প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালেন এবং একটি বিল তৈরী করলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন তদানীন্তন বিধানসভার প্রেসিডেণ্ট সি. ভি. এস. নরসিংহ রাজগুরু। যাঁর নাম শ্রীমতী রেড্ডী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমতী রেড্ডীর এই বিল আইনে পরিণত হয় ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে। এরপর থেকেই দেবদাসী প্রথার শিকার হওয়ার বিচিত্র শৃঙ্খল থেকে দুর্ভাগিনী মেয়েরা মুক্ত হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য দণ্ডদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা কোন সময় সঠিক ভাবে কার্যকরী হয় নি।

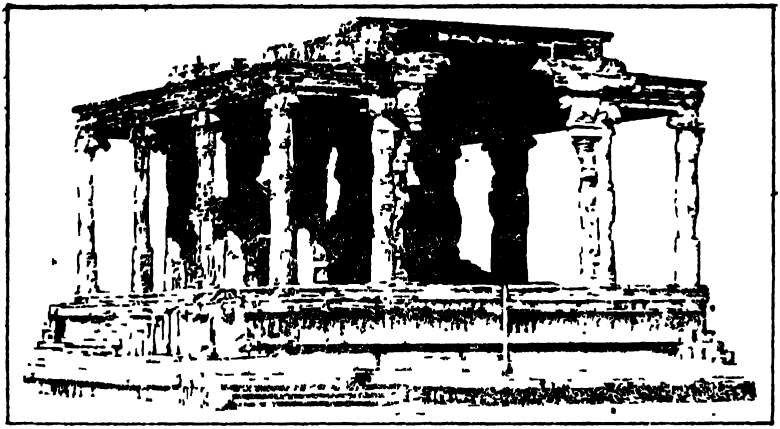

অচলায়ন ভাঙ্গার বোধ

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় দেবদাসীদের সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই প্রথা যে দেশের সামাজিক প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ সে কথা প্রায় সকলে বলেছেন। ডাঃ অ্যানী বেশান্ত তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীর স্থান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'কুমারী মেয়েরা দেবমন্দিরে দাসীবৃত্তি স্বীকার করতো জনকল্যাণের জন্য। তাদের সকলে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ক্যাথলিক ধর্মমন্দিরের সেবিকাদের মতই তাদের কাজ ছিল জনকল্যাণে আত্ম-উৎসর্গ। কিন্তু বর্তমানে এই ধর্মাচরণের ক্ষেত্রটি কলুষিত হয়েছে।" পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও এই প্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই প্রথার বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার হয়েছেন। অবশ্য ডাঃ বেশান্তের বক্তব্যে বাস্তব উদাহরণ ছিল না। তিনি ক্যাথলিক গীর্জার সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে দেবদাসীদের তুলনা করেছেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনো মিল নেই। তাছাড়া ধর্মের নামে ক্যাথলিক সেবিকাদেরও নানা প্রকার অবমাননা সইতে হয়েছে। বোকাচ্চিও, মার্কুইস দ্য সাদ, র‍্যাবেলে, ভল্‌তেয়ার প্রভৃতি লেখকগণ তাঁদের রচনায় তীব্রভাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছেন। ক্যাথলিক সেবিকাদের কাহিনী ভিত্তিহীন ছিল না কিন্তু ধর্মের আবরণ ছিল গোপনতার জন্য। য়ুরোপে ঘটনাগুলি ঘটেছে গোপনে, কিন্তু ভারতে দেবদাসীপ্রথা প্রকাশ্য গণিকা-বৃত্তির প্রথা। সন্ন্যাসজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো কিছুই তার মধ্যে ছিল না। তাদের কাজ ছিল জনকল্যাণ সাধন নয়, জনমনোরঞ্জন। সমাজজীবনে

এই প্রথা সেজন্যই কলংককর। ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী মঠে আশ্রয় নিতে যায় ধর্মজীবনযাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই। কিন্তু দেবদাসী মন্দিরে আশ্রয় পায় অপমানকর জীবন যাপনের জন্য।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদদের এই সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির মতো সচেতন সমাজ সংস্কারকরা। এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য শ্রীমতী রেড্ডী যে প্রচণ্ড সাহস ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই সংগ্রামে নেমেছেন, তার তুলনা বিরল। আইন প্রণয়ন করে সুসংগঠিত এই পণ্যব্যবসায়ীদের যে সম্পূর্ণ দমন করা যায় না, তা তিনি জানতেন। তবু এ ব্যাপারে আইনকে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। বিধবা-বিবাহের মত একটা ব্যাপার যে আইন প্রণয়নের দ্বারা সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন, তবু বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের একটা সুদূর প্রসারী ফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। দেবদাসী নিয়োগ বিরোধী আইনও দেবদাসী প্রথা বিলোপের সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাঃ রেড্ডীর কৃতিত্বের বিরাট পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। একটি পত্রে দেবদাসীরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মর্মস্পর্শীভাবে তাঁদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কীভাবে মন্দিরের আড়াল দিয়ে এই অনাচার চালিয়ে গেছেন, তার ইতিহাসও তাদের জবানীতে লভ্য। ডাঃ রেড্ডীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই 'বাসবি' সম্প্রদায় আজ নতুন করে তাদের দাবী নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। বাঙ্গালোর শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে তাঁরা দাবি তুলেছেন আইন সম্মত অধিকারের, তাঁদের পুত্রকন্যার সামাজিক স্বীকৃতির, দাবী করেছেন নতুন কর্মসংস্থানের। কর্ণাটক, বোম্বাই, গোয়া, গুজরাত, সর্বত্র নারীসমাজ সংঘবদ্ধ হতে চলেছে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ফলে নারীমুক্তির এক নতুন পথনির্দেশ ঘটেছে।

বর্তমানে দেবদাসী-প্রথা নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। বোম্বাই, বাঙ্গালোর ও সুরাটের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থা থেকে সংগঠিত ভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত গবেষণার ব্যাপারটি আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হয় নি। বাংলা দেশের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে উল্লেখ সামান্য। এ সম্বন্ধে কোন ব্যাপক গবেষণাও হয় নি। অদ্যবধি নানান চেহারায় এই প্রথার একটা ক্ষীণ আভাস বাংলা দেশেও দেখতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার 'নাচনী' সম্প্রদায় দেবদাসী প্রথারই

একটি ভিন্ন রূপ। এদের উদ্ভব ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটি ব্যাপক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। অবশ্য গবেষণার মাধ্যমে কেবলমাত্র ঘটনাগুলির অস্তিত্ব জানানোই যথেষ্ট নয়, কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এর পশ্চাৎপটে কাজ করছে বা করেছে, কিভাবে তার বিবর্তন ও পরিবর্তন চলেছে, তার গভীর অনুধ্যান না থাকলে সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র আভাসিত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি যে এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেটা আনন্দের বিষয়।

ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে চল্লিশের দশকে যে অবস্থা ছিল, তা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। নতুন প্রজন্মের সামনে অর্থাগম ও অর্থোপার্জনই একমাত্র মূল্যবোধ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। ভোগ্যপণ্যের বিপুল সমাবেশ পরিতৃপ্তির উপলব্ধিকে মুছে দিয়ে তৃষ্ণার দৌড়বাজিতে ধাবমান। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সবই আজ চমকপ্রদ তথ্যসমষ্টির নিদর্শন। শিল্পকলা আজ কেবল আমোদ দেয়, আনন্দ দেয় না। এই শিল্পকলা আজ নতুন করে নব কলামন্দিরের সৃষ্টি করেছে। এই মন্দিরের দেবদাসীরা আজ ধর্মীয় আবরণে আবৃত নয়। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই নবকৃষ্টি মন্দিরের দেবদাসী সংগ্রহের ব্যবস্থা। অন্যদিকে লোকনৃত্যের আসরে লোকসংস্কৃতির নামে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে থেকে শিল্পীসংগ্রহের চেষ্টা ও তার মাধ্যমে আর একটা পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা। শিক্ষিত জনগণ নগরমুখী, ধর্মের ব্যাপক অনুশাসন থেকে মুক্ত। কিন্তু অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যে দেবদাসীপ্রথা আজও অব্যাহত। শিল্পপণ্যের হাটে যে নব কলামন্দিরের অবস্থান, তারই নতুন পুরোহিতের হাতে আজ চিত্রজগৎ, নাট্যজগৎ সব কিছু। নারীদেহ আজ পণ্য হিসাবে বিপণি শ্রেণীতে ঝলমল করছে, এর শেষ কোথায়?

সমাজ বিবর্তনের এই দিকটি কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এর পিছনে বিশেষ শ্রেণীর এবং বিশেষ ব্যক্তিরও ভূমিকা কার্যকরী ছিল। মিশ্র অর্থনীতির সামাজিক পরিবেশে সৎ প্রচেষ্টাও সর্বত্র সার্থক হয় না। যে প্রচণ্ড ন্যায়বোধ, শ্রেয়োবোধ এক সময় শিক্ষিত মানুষের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল, সেই ন্যায়বোধ, সেই শ্রেয়োবোধ আজ মৃদু বিষপ্রয়োগে মৃতপ্রায়। সেই জন্যই দেবদাসী-প্রথা সম্বন্ধে কৌতূহল কেবলমাত্র একটা সাময়িক উত্তেজনার খোরাক যোগায়, কোনো গভীর শ্রেয়োবোধের দ্বারা এর বিলোপ সাধনের জন্য উদ্দীপ্ত করে না।

দেবদাসী প্রথার বিবর্তন

বাংলা দেশে দেবদাসী প্রথা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন করে মানবদাসীত্বে পর্যবসিত হয়েছে, তার কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই।

মধ্যযুগে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে দাসীপ্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নবাব ও সুলতানদের হারেমে নর্তকীর সংখ্যা বাড়লেও ঐ সময়ে মন্দির কেন্দ্রিক দাসত্বের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। উড়িষ্যায় কিন্তু হিন্দু রাজার অধীনস্থ মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা একইরকম ভাবে চলে এসেছে। অদ্যাবধি পুরীর মন্দিরে দেবদাসীর অস্তিত্ব রয়েছে দেবতার একান্ত অন্তরঙ্গ সেবিকা হিসাবে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে দেবসম্মুখে নৃত্যোৎসব হয়ে থাকে। প্রখ্যাত ওড়িশী নৃত্যকলাবিদ্‌গণ এই দেবদাসীনৃত্যের অনুসরণে অদ্যাবধি নৃত্য পরিকল্পনা করে থাকেন। তবে রাজপদের অবলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবদাসী নিয়োগ প্রথারও অবলোপ ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

দেবদাসী প্রথার উদ্ভব ও প্রচলনের অন্যতম কারণ হ'ল নৃত্য ও সঙ্গীতকলাকে রাজপোষণের আওতায় এনে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া। এই কলাবিদ্যা রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এদের ভরণ-

পোষণ অন্তত প্রাচীন ও মধ্যযুগে, রাজকোষের সহায়তায় ছাড়া সম্ভব ছিল না। রাজা যখন বিধর্মী, তখন ধীরে ধীরে এই নৃত্যকলাও নবধর্মের রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হলো। উত্তর ভারতের মজলিসী নাচের উদ্ভব সমকালীন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ফসল। দেশীয় নৃত্যকলা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর সুনির্দিষ্ট-ভাবে কোনো guild বা সংঘের মধ্যে সুসম্বদ্ধ থাকতে পারে নি। দেশীয় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে দুটি সুনির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়ে যায়। একটি দরবারী নৃত্য-কলা, যা পুরোপুরি পশ্চিম ভারতের অনুসরণ করে চলেছে, অন্যটি লোকনৃত্যের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। এই ব্যাপারে দুটি উদাহরণ আমরা উনিশ শতকেও দেখি। একটি খেমটা নাচ, যা নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের সভায় বেশ ব্যাপকভাবেই অনুষ্ঠিত হ'তো, পরে যা নতুন শহরের বাবুদের রক্ষিতা গণিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু হয়ে যায়। অন্যটি পুরুলিয়ায় বীরভূম অঞ্চলের 'নাচনী' নাচ। নাচনী সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গ্রামীণ নারী নৃত্যের স্থান অধিকার করেছে। 'ঝুমুর' নাচের দল এই দুই ধরণের নাচই দেখিয়ে থাকে।

দেবদাসী প্রথা বলতে আমরা যা বুঝি, তা হ'ল মন্দির-কেন্দ্রিক গণিকাবৃত্তি, যাতে সামাজিক কলঙ্কের ভয় নেই। বাংলাদেশে তথা উত্তর ভারতে এই মন্দির-ভিত্তিক গণিকাবৃত্তির মধ্যে দুটো ধারা বর্তমান। কিশোরী ভজন, বীরাচারী তন্ত্রসাধন ইত্যাদির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এইগুলিতে নৃত্যগীতের অবকাশ নেই। এছাড়া আরো কতকগুলি সামাজিক কদাচার আছে, 'গুরু প্রসাদী' ইত্যাদি। নৃত্যগীতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্মাচরণের আওতার বাইরে চলে গেছে। নৃত্যগীত ও অভিনয় এখন যে সম্প্রদায়ের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল, তাদের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত যথেষ্ট সামাজিক কলংক ভোগ করতে হতো। অবশ্য এই দুটি ধারায় দাসত্বের বন্ধনের ব্যাপারটা অনেকটা শিথিল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নারীসমাজের উপরে, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের নারীদের উপরে অর্থনৈতিক কারণে এই বন্ধনের ফাঁসটা বেশ কঠিন।

শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণ পণ্য চলাচল ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই শিল্পোন্নতির দাম দিতে হয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষদের, যারা ক্রমশ এক ছিন্নমূল অস্তিত্বের শিকার হয়ে পড়েছে। এই কুলি কামিনরা এখন উচ্চশ্রেণীর কেরানী বাবুদের ভোগ্য পণ্যের মতই। সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা একেবারে হাটের বিকি-কিনির পণ্য হয়ে গেছে। এ ছাড়া আছে bonded labour-এর প্রশ্ন। ছেলে বা মেয়েকে বন্ধক রেখে প্রয়োজন মেটানোর মতো খাবার বা জমিটুকু রাখা।

দেশে একটা বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষ হলে প্রথমেই স্ত্রীলোক ও শিশুরা জড় হয়। চা-বাগান, কয়লার খনি অথবা অন্য কোনো জায়গায় অস্থায়ী কাজের জন্য মেয়ে শ্রমিকদের এ-সব জায়গায় শ্রম বিক্রি ছাড়া শরীরও বিক্রয় করতে হয় জীবনধারণের প্রয়োজনে। এই ভাবেই এখনো চলেছে দাসপ্রথার অব্যাহত ধারা। দেবদাসী আর এই বন্ধকী মজুরদের মধ্যে আজ আর খুব বেশি তফাৎ নেই।

আশংকার কথা এই, বর্তমানে প্রাচীন লোক-সংস্কৃতির নবমূল্যায়নের নামে এই দেবদাসী প্রথা এবং অন্যান্য অনুচিত ঘৃণিত প্রথাগুলিকে সমর্থন করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। রোমাণ্টিক ভাববিলাসের রসে জর্জরিত করে এই প্রাচীনায়ন নানা ভাবে চলছে। ইসলামের ১৪০০ বছর উদ্‌যাপনের সুযোগে নতুন করে পর্দাপ্রথা, নারীর চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ এসব আরোপিত হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। দেবদাসী প্রথাকেও নতুন ভাবোদ্দীপনা মণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে উজ্জ্বল করে দেখাতে চাইছেন কেউ কেউ। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে দাস হয়ে কেউ জন্মায় না, দাসীপুত্র হয়েও নয়। একশ্রেণীর শক্তির দম্ভই অপর শ্রেণীর মানুষকে দাসে পরিণত করে। কিন্তু মানুষের সমানাধিকারের দাবী চিরদিন নিষ্ক্রিয় নির্বাক থাকতে পারে না। শুভচেতনা সম্পন্ন মানুষের শুভবুদ্ধি মানুষের অধিকারকে একদিন প্রতিষ্ঠিত করবেই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়
২। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার
৩। History of Bengal—A. K. Sur
৪। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য—জনার্দন চক্রবর্তী
৫। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন
৬। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন
৮। চৈতন্য ভাগবত—আদিলীলা ২য় অধ্যায়
৯। চৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্যলীলা
১০। Castes and Tribes of India—Ghureye
১১। A Study into Exploitation of Harijan Women—
Harijan Sevak Sangha
১২। Autobiography—Sm. Muthulaxmi Reddy
১৩। Traditions of Indian Folk dance—Kapila Vatsyayan
১৪। বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ (শতবার্ষিকী গ্রন্থমালা)
১৫। দোন্ ধ্রুব—ভি. এস. খন্দেকর (অনুবাদ—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়)
১৬। জনপদবধূ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। ভারতের নৃত্যকলা—গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়
১৮। রাগ ও রূপ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৯। ভরত নাট্যশাস্ত্র—৩৫/৬০—৬২ সূত্র
২০। প্রবন্ধ ঃ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
অশোকনাথ শাস্ত্রী
রাজ্যেশ্বর মিত্র
২১। কুট্টনীমতম্ ঃ—দামোদর ভট্ট
২২। ঋগ্বেদ—১০-৯৫ সূক্ত
২৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ

২৪। মহাভারত উদ্যোগপর্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহ

২৫। মহাভারত বনপর্ব—

২৬। মেঘদূতম্—কালিদাস গ্রন্থাবলী

২৭। Encyclopaedia Britannica :—Ref :—Dance, Prostitution,

২৮। Gazetteer of India (People)

২৯। Orissa Gazetteer

৩০। Mysore Gazetteer

৩১। Maharastra Gazetteer

৩২। Devadasi Problem : Special issue of Bahni. Occassional Journal of Joint Women's Programme.

৩৩। A Short History of the World—Manfred. Moscow Publication

৩৪। Notes of Indian History—Karl Marx

৩৫। The British Rule of India—(Collected Works)—Karl Marx.

৩৬। World of Courtesans :—Moti Chandra.

৩৭। কামসূত্র :—বাৎস্যায়ন